দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ভূমিকাঃ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্ব-ইতিহাসের এক সংকটমুহূর্তে। বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের প্রতিক্রিয়ার উত্তরে যে আন্দোলনটি জন্ম নেয় তার ইতিহাসই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ থাকবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি।

প্রাক্-কথনঃ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ঐতিহ্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি করে আঘাত দিয়েছিল কিছু এলিটসম্প্রদায় ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিদের চেতনাকে। আঘাতপ্রাপ্ত এই চেতনার থেকেই রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, অঁরি বারবুস প্রমুখ 'চিন্তার স্বাধীনতা'[1]-র সপক্ষে কলম তুলে নেন। শিল্প ও শিল্পীসংক্রান্ত(বস্তুত এগুলি ধনতন্ত্রীর অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসসম্পদ)সমস্যাগুলি এর আগেও নানাভাবে আলোচিত হলেও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তখনই দেখা দেয়। এর অনেক আগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন তাঁর প্রবন্ধে[2] স্পষ্ট করে বলেন যে, বুর্জোয়া-ব্যবস্থায় কোন শিল্পীর প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজন শ্রমিকের মতই শিল্পী তাঁর শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য, তাছাড়া আছে ব্যক্তিস্বার্থের বাধাপ্রবণতা, রাষ্ট্রিক স্বার্থের শাসনপ্রণালী বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপার। তবু বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যত অল্প পরিমাণেই হোক, শিল্পীর স্বাধীনতা অংশত বজায় থাকে, কিন্তু ফ্যাসিবাদে সে স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত। নাৎসীরা বার্লিনের রাস্তায় বই পুড়িয়ে সাংস্কৃতিক জগতে আঘাত হেনে সেই সত্যই তুলে ধরেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকেও নানাভাবে আলোড়িত করেছে। জনৈক সমালোচক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে কবি-হৃদয়ের প্রবল আলোড়ন ও তাঁর মানবতার প্রতি গভীর বিশ্বাসের মধ্যে প্রগতি সাহিত্যের সূচনা লক্ষ্য করেছেন।[3] কথাটা অংশত সত্য। অংশত, কারণ, যে রাজনৈতিক সংগঠন তার জন্যে দরকার, যে সমাজচেতনাসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর মিলিত উদ্যোগ দরকার, অথবা ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ তথা পুঁজিবাদের বিভিন্ন স্তর-যথা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সম্যক ধারণা থাকা দরকার, বাংলাদেশে কি ভারতবর্ষের কোথাও সে-চেতনার অস্ফুট পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও তার সূচনা আরও পরবর্তীকালে। সফল নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ)পর রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে--এরই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও গণতন্ত্র উচ্ছেদের অভিসন্ধির সমন্বয়ে বিশ্বপরিস্থিতি এক চূড়ান্ত সময়ের সম্মুখীন হয়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন এই সময়ের সৃষ্টি।

বাস্তবিকপক্ষে ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদকে পরাস্ত ও প্রতিরোধ করবার মানসিকতা থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের

সামাজিক-দায়িত্ব স্বীকারের যে উদ্‌ঘোষণা, এই আন্দোলনে তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিশ্বজনমত গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তারই অনুসারী। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন জাতীয় আন্দোলনের প্রবহমান দুটি ধারার একটি অহিংস ও অপরটি সহিংস আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র অর্জন করে চলছিল। ইতিমধ্যে দুইয়ের দশকে সমাজতন্ত্রসম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কানপুর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পরবর্তীকালে যুদ্ধবিরোধী ভাবং আন্দোলনে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায়, কৃষক সংগ্রামে (তেলেঙ্গানায়, তেভাগায়), শান্তির সপক্ষে প্রচারে কমিউনিস্ট পার্টি যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মার্কসবাদ তথা সাম্যবাদের তত্ত্বের প্রতি এ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মননচেতনা আকৃষ্ট ও কর্ষিত হওয়ার পরেই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ। বাংলাসাহিত্যের ধারায় একে বিচ্ছিন্ন, একক ও আকস্মিক উপধারা বলাটা সমীচীন হবে না। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন খানিকটা অপরিস্ফুট রূপে বা অস্পষ্ট আকারে ছাপ ফেলতে শুরু করেছিল কখনও রবীন্দ্রকাব্যের অতীন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধাচারণ করে, কখনও 'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকাগোষ্ঠীর সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে। এঁদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল 'নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ, দরিদ্রশ্রেণী, সমাজের অন্তেবাসী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে'[4] সৃষ্ট যে নতুন জনকল্লোল, তার সু-রূপে, রূপে, পৌঁছোনো। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এর ফলে 'স্বাদু পানীয়ের চেয়ে ফেনাক্ত পাঁকই ঘুলিয়ে'[5] উঠেছে যদিও, তথাপি এই প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। এই বোধ বা চেতনা সমাজসম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। মোটামুটিভাবে বলা যায়, তখনকার সাহিত্যিকদের জীবনদর্শন ও আদর্শ হল 'bourgeoisie cult'। এ ছাড়া আর একটি কথা। বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শনে যে উদারতা প্রকাশ পায়, তাকে নতুনতর মাত্রা দিতে এ পর্বের সাহিত্যিকগণ সচেষ্ট হন। কডওয়েল বলেছেন, বুর্জোয়া প্রতি পদক্ষেপেই বিপ্লবী, কারণ, প্রতি পদক্ষেপেই সে তার নিজের ভিত্তিকে বিপ্লবায়িত করছে।[6] এই বৈপ্লবিক ভিত্তির ওপরে রবীন্দ্রনাথ ও কল্লোল-পর্বের শরৎচন্দ্র-নজরুল-প্রেমেন্দ্রমিত্র-যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের যে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তার প্রগতিশীলতাকে স্বীকার ও স্বীকরণ করেই পরবর্তীকালে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন এক অগ্রচারী ভূমিকা গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের সৃষ্ট ধারার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল আর একটি ধারা, সে ধারা প্রবর্তনে সকল মতের বিপ্লবের দান ছিল অপরিসীম। মুজফ্ফর আহমদ 'লাঙল', 'গণবাণী'র মাধ্যমে মার্কসীয় চিন্তার উন্মেষে সাহায্য করে চলেছিলেন। নজরুল ইসলাম তাঁর সান্নিধ্যে এসে শোষিত ও নিপীড়িত চাষী ও শ্রমিকের পক্ষে কলম তুলে নেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ)-র মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি তার আত্মপ্রকাশের পথ

প্রশস্ত করে তোলে। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে এক নতুন মতবাদ, শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসংগঠন, ও শ্রেণীসংগ্রামের এক বিশাল ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনের পথে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। কারণ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। সাহিত্য-সংস্কৃতি এতদিনকার যেন প্রাচীন ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে আসছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে তাতে ফাটল ধরে এবং পরে তিরিশের দশকে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে বসে। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা এর ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির এলাকায় প্রবেশাধিকার লাভ করে জীবনের ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রাজনীতি হয়ে ওঠে সাহিত্যের [illegible] বিষয়বস্তু, সাহিত্য এই নবতন দানে পেয়ে যায় এক বিপুল ব্যাপ্তি।

হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়'-এর ইতিহাসে লিখেছেন, 'ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে এদেশে রীতিমতো মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও আলোচনা ধূর্জটিবাবুর আগে আর কে করেছিলেন জানি না।'[৭] ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসবাদের আলোচনায় পথিকৃতের মর্যাদার দাবিদার, বিশেষত বাংলা ভাষায়। হিরণবাবুর মতে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সমস্যার আলোচনা'[৮] করেছেন, 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটিতে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা ঘিরে মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনার বিস্তৃতিও একেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'অগ্রণী', 'অরণি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এইসব আলোচনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার জমি তৈরি হয়ে ওঠে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে এরই নিবিড় ভিত্তিতে।

বৈদেশিক রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, ইটালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানে ইউরোপে কিভাবে গণজাগরণ ও গণপ্রতিরোধের সম্ভাবনা ও সূচনা জেগে ওঠে। রাজনীতিবর্জিত মানুষকেও এই সব ঘটনা নানাভাবে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ভিত্তি একদিকে নৈতিক ও মানবিক, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাসূচক। এই শুভবোধের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করতে বিশ্বের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ভূমিকা ছিল নজিরবিহীন। বিশেষত আন্তর্জাতিক বোধের দিক থেকে। স্পেনের ঘটনা এতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার্থে এসময় দেখা যায় সাহিত্যিক-শিল্পীরা আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের মাধ্যমে আত্ম-উৎসর্গে উৎসাহিত হন।

ভারতবর্ষে, তন্মুহূর্তে সেরকম পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়নি। তাসত্ত্বেও এদেশে এই আন্দোলন শুরু হল। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকাঠামোয়। বুর্জোয়া শিল্প বিকাশও ভালভাবে গড়ে ওঠে নি, সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠবার আগে এদেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন, সামগ্রিক অর্থেই এই আন্দোলন জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে আপোষে-মীমাংসায় অগ্রসর হতে থাকে। যে জাতি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডে (১৯১৯খ্রীষ্টাব্দ) জেগে ওঠে, খিলাফৎ আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে, লবণ আইন আন্দোলনে বা স্বাধীনতা সংগ্রাম

ঘোষণায় (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) সেই জাতিরই একাংশ বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য নয়, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী শিবির ত্যাগ করে অনেকেই জেলখানার কারাকক্ষে মার্কসবাদী বিপ্লবকে মানবমুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে মেনে নেন। তখনকার অনেক বিপ্লবীই তাঁদের স্মৃতিচারণামূলক এইসব তথ্য নিবেদন করেছেন। এবিষয়ে মজার তথ্য দিয়েছেন শ্রী সুধাংশু দাশগুপ্ত মহাশয়। আন্দামান সেলুলার জেলেও নাকি মার্কসবাদী বই-পত্রের নিয়মিত পঠন-পাঠন হত আর সেইসব বই জেলের ভেতরে সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থাও নাকি ছিল।[৯] যাই হোক, এই অবস্থায় কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্য দিয়ে সবিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব যাঁর মাধ্যমে ফ্যাসিবিরোধিতার সূত্রপাত, এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার ছিল? এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দুটি প্রান্তবর্তী সীমানার মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গত এ কথাও স্বীকার্য যে এই মেলবন্ধনপ্রয়াসে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য অনুসরণের ভেতর দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এদেশের সদ্য গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরা। প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের প্রাক্-পটভূমি এভাবেই তৈরি হয়।

ভারতে প্রগতি লেখক সংঘের সূচনা : ইতিবৃত্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এ দেশে নয়, বিদেশে, লন্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে, 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠায়।'[১০] তিনি আরও জানিয়েছেন যে, সেই আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা সবাই লেখক নন। তাঁদের অন্যতম হলেন, মুলুকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ প্রমুখ। মোটামুটিভাবে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় মুলুকরাজ আনন্দের কলকাতা সম্মেলনের (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) একটি বক্তৃতায়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রীটের নানকিং রেস্তোঁরায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম ইস্তাহারটি পাঠ করা হয়। তাঁর মন্তব্য: 'For, since the historic meeting in the Nanking Restaurant in Denmark Street where the original Manifesto was read'.[১১]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ'-এ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিবেদন করেছেন। তিনি লিখেছেন, '১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।'[১২] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ লেখক সংঘ গঠনের প্রতিষ্ঠাবর্ষ হিসেবে ধরে নিলেও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ এর উৎস-নির্দেশক বর্ষ হিসেবে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ-সম্মেলনের প্রাক্কালে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০-এপ্রিল তারিখে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writers' Association) গঠিত হয়। মুন্সী প্রেমচাঁদ ছিলেন এর সভাপতি। প্রেমচাঁদ ছাড়াও আব্দুল হক, সয়্যা নজ্রইন নিজাম, আবিদ হোসেন প্রমুখ প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। অন্যতম বক্তা ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু ও উর্দু কবি মওলানা হসরৎ মোহানী। উত্তর ভারতের লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশপাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রুশীদা জাঁহা, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, সাজ্জাদ জহীর (সংঘ-সম্পাদক), দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তেলেগু কবি আব্বুরি রামা রাও(অথবা রামকৃষ্ণ রাও) ; বাংলা থেকে চারজন প্রতিনিধির অন্যতম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১৩] এই সম্মেলন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ ধন্য হয়।[১৪] এই সংঘের মূল ইস্তাহারের বাংলা অনুবাদ এদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেইসময়। এখানে 'প্রগতি' সংকলন থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

'সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রতাপ ও প্রকৃতিকে ছেড়ে ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রক্তমাংসজী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

আমাদের সমাজে যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিবাদী মতবাদকে বেগবান করা, এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য। তাঁদের উচিত সাহিত্য বিচারক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা যা পারিবারিক, যৌন, ধর্মচিন্তাগত, যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্ত সাহিত্য প্রসঙ্গ থেকে প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাদগামী মনোবৃত্তিকে উন্মুলিত করবে, এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

যে পরিবর্তনবিদ্বেষী শ্রেণীর হাতে বহুকাল যাবৎ সাহিত্য ও অন্যান্য কলার অধোগতি ঘটেছে, তাদের কবল হ'তে সাহিত্যকে উদ্ধার করা আমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ, আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক, আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবী করি। আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না। ...

'আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা— নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের

নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।'

এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশের লেখকদের একত্র ও সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত ছিল দেশের অভ্যন্তরে প্রগতিকে বিস্তৃত করা। ইস্তাহারে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবুও সাজ্জাদ জহীরের পঠিত প্রবন্ধের মৌল বক্তব্য অনুধাবন করা দরকার:

'Our culture, which we wanted to reinvigorate, which we wanted to use as an instrument of service, of enlightenment and of joy for the entire people of this country, was withering away before our very eyes. On the one hand the grievous restriction of education to an infinitesimal minority of the Indian population by a foreign and unsympathetic administration, the poverty and misery of the Indian people as a whole, the growing curse of unemployment among the intelligentsia; on the other hand the policy of abject revivalism, the senile attempt at copying the artistic forms and concepts of our past, even though the present social environment was entirely different, resulted in making Indian art and culture hopelessly restricted, devoid alike of vision and the actualities of life'. জহীর চান, আমাদের সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি তুলে ধরুক, বাস্তবকে গ্রহণ করুক, তাঁর ভাষায় :

... were feeling the need of making a break with the supine and escapist literature with which the country was being flooded; of creating something more real, something more in harmony with the facts of our existence today, something which will make our art fullblooded and virile.) ইত্যাদি। জহীর তাঁর প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেন, দেশের প্রত্যেকটি জায়গায় সকালে বা প্রত্যেক মাসে প্রগতিশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা আসরে পঠিত ও আলোচিত হবে যাতে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন নতুনত্বে, বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন,

We knew, of course, that good literature could not be produced 'to order'. But we aimed at creating those conditions for our writers which would help them in their work through mutual criticism and just appreciation; by inducing our writers to study closely the life of our people, a suitable milieu was to be created for the new literature of India to grow and to flourish'. এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ১০ এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ-এর এই সম্মেলন এক ল্যান্ডমার্ক বিশেষ। এর কারণগুলি সাজ্জাদ জহীর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন :

'Firstly, it was the first all India gathering of writers, writing in different Indian languages, but wanting to unite for solving out common national cultural problems.

Secondly, this Conference looked at literature not from the point of view of a pedant, as something apart from the rest of life, but as a social product, and as such moulded and influenced by social environment. Social convulsions did not leave literature alone, and therefore it was the duty of our writers to take account of them, to consciously help through their writings the forces of enlightenment and progress, to struggle against reaction and ignorance in whatever form they may manifest themselves in society.

Thirdly, the Conference realised that although we were to produce literature of a new kind, yet we were not rejecting our literary heritage; in fact we asserted that only progressive writers and not pedantic reactionaries, worshipping dead forms, could claim to be the true inheritors of all that was best in our classical literature.

Fourthly, we defined at this Conference our creed in the manifesto which gave a minimum basis of unity for all those writers,

who, though differing in many ways, were united as far as the progressive writers' movement was concerned'.[১৬]

সম্মেলন শেষে সংঘকে প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বে, পুনা, আমেদাবাদ, বেনারস, পাটনা, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে এই সংঘের শাখা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইস্তাহারেই অবশ্য সে-কথা বর্ণিত হয়। সম্মেলনে সর্বমোট পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য প্রস্তাবগুলি হল (১) চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) যুদ্ধ-সংক্রান্ত, (৩) ছাত্রদের অধিকারজনিত ও (৪) জেনিভায় শান্তিসম্মেলন-সংক্রান্ত। চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে (২নং প্রস্তাব) বলা হয়:

'This Conference of Progressive Writers strongly protests against the restrictions placed by the Government on the freedom of thought and expression by promulgating repressive Press Laws, Customs Act, and Criminal Law Amendment Act, and in this way arbitrarily suppressing hundreds of journals and magazines, prescribing progressive literature and stopping the entry into this country of a large part of radical literature from foreign countries. This Conference considers these restrictions to be a serious attack on the free cultural development of the country, and calls upon all Indian writers to organise country-wide protests against the Government policy and to support all other efforts to secure the repeal of these laws'.[১৭] তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, সাহিত্য হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। এর কোন ভৌগোলিক সীমা নেই। অথচ এই সমস্ত সম্পদরাজিকে ফ্যাশিস্ট শক্তি নির্মূল করে দেবার চক্রান্ত করছে:

'We consider that literature is the heritage of the whole human races and is not divisible in national, racial or geographical boundaries. Further we consider that collectively and individually we stand in the ranks of those who are striving to build a new social order based on equality, freedom and peace, and as such we

cannot but protest against the anti-cultural forces of Fascism and militarism. We declare that war is a brutality and is a serious menace to human culture and progress.

Further we resolve to strive to help the forces of international peace and such national aspirations as are consistent with them'.

এই সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে মুন্সী প্রেমচাঁদ 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি' সম্পর্কে হিন্দুস্থানী ভাষায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, জীবনের সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়:

'Literature can best be defined as a criticism of life. The literature of our immediate past had nothing to do with actuality; our writers were living in a world of dreams and were writing things like 'Fasanai Ajaib' or 'Chandra Kanta', tales told only for entertainment, or to satisfy our sense of wonder. Life and literature were considered to be two different things which bore no relation to each other. Literature reflects the age. In the past days of decadence the main function of literature was to entertain the parasitic class. In this literature the dominant notes were either sex or mysticism, pessimism or fatalism. It was devoid of vigour, originality, and even the power of observation'. প্রেমচাঁদ এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিকের দায় ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

'All that is ugly, or detestable, all that is inhuman, becomes intolerable to such a writer. He becomes the standard bearer of humanity, of moral uprightness, of nobility. It becomes his duty to help all those who are downtrodden, oppressed and exploited — individuals or groups — and to advocate their cause. And his judge is society itself - it is before society that he brings his plaint.

He knows that the more realistic his story is, the more full of expression and movement his picture, the more intimate his observation of human nature, human psychology, the greater the effect he will produce'.

প্রেমচাঁদ আরও বলেন যে, 'প্রগতিশীল লেখক' কথাটা ত্রুটিপূর্ণ , তাঁর মতে, 'an artist or a writer is by his very nature progressive'। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন , 'But perhaps it is necessary to use this qualifying word because progress has a different meaning for different people. For us 'progressive' is that which creates in us the power to act; which makes us examine those subjective and objective causes that have brought us to such a pass of sterility and degeneration; and finally which helps us to overcome and remove those causes, and become men once again'.[১২]

সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'Tendencies in Contemporary Bengali Literature' প্রবন্ধটি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঠ করেন।[২০] এই প্রবন্ধটিতে সুরেন্দ্রনাথ মার্কসীয় অর্থনীতি প্রয়োগ করে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পটভূমির বিশদ পর্যালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্দিন, কল্লোল-যুগের রবীন্দ্র-বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেন। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সুধীন্দ্র নাথ দত্তের অবদানকেও তিনি যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত। এর মধ্যে তিনি শিল্পযুগের টেকনিক-সর্বস্বতার চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন। এবং আশা প্রকাশ করেছেন এই বলে- 'This technique will be very useful for anyone who wishes to represent the fusion of agriculture and industry which will be the social background of literature in Bengal in the immediate future'.[২১]

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহার প্রকাশিত হয় ২৮জুন, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। সম্মেলনের নানা খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে একটি প্রতিবেদন

প্রকাশ করে এই শিরোনামায়ঃ 'Communist Propaganda : Moscow Changes Tactics.'[২২] এই কুৎসার উত্তরে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন সংঘের সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর। তিনি বলেন, 'প্রগতি লেখক সংঘ কোনও গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নহে ...আমাদের ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারাই আমাদের সংঘের সদস্য হইতে পারেন। ...স্টেটসম্যান ও ভারত গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে যতটুকু বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি তাহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি আশা করি না, কিন্তু ভারতের শিক্ষিত সমাজ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রণিধান করিয়া সঙ্ঘকে সমর্থন করিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করি।'[২৩]

এই সম্মেলনের কিছুদিন পরেই ইস্তাহারে ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপন করার উদ্যোগ শুরু হয়। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সক্রিয় উদ্যোগে সংঘের শাখা স্থাপিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ নামে।

সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্ণৌ-সম্মেলনের অব্যবহিত পরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেও দিল্লী অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজে'র দাবিতে কংগ্রেস অনড় থাকে। প্রস্তাবে সে সময় বলা হয়েছিলঃ

'We remind ourselves on this, the solemn national day, that complete Independence is our birthright and we shall not rest till we have achieved it.'[২৪]

পরবর্তীকালে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিকরণের কাজ অব্যাহত থাকে। লক্ষ্ণৌতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জেনিভায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সম্মেলনকে জাতীয় কংগ্রেসের তরফে সমর্থন জানানো হয়।[২৫] অধিবেশনে আরও দুটি স্মরণীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় যার একটি হল যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা[২৬] এবং আক্রান্ত আবিসিনিয়ার সপক্ষে সমর্থনজ্ঞাপন।[২৭] জাতীয় কংগ্রেসের এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরও কয়েকটি কারণে। কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠান গণজীবন থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এই অধিবেশনে তার সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৪ এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈকালিক অধিবেশনে পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের নেতৃত্বে গৃহীত 'কংগ্রেস এবং গণসংযোগ' শীর্ষক ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়ঃ

'The Congress is of opinion that it is desirable to develop closer association between the masses and the Congress Organisation..... With a view to this, and further to bring about closer cooperation

with other organisations, of peasants workers and others, which aim at the freedom of the Indian people and to make the Congress a joint front of all the anti-imperialist elements in the country, this Congress appoints a committee consisting of Sriyuts Rajendra Prasad, Jairamdas Daulatram and Jayprakash Narayan to make recommendations in this behalf including proposals for such amendment of the Constitution as may be considered necessary.'[28]

কংগ্রেসের ভেতরে সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থীদের প্রভাবের ফল হিসেবে এই ঘটনাকে দেখতে হবে।[29] জাতীয় কংগ্রেস এদেশের কৃষক-শ্রমিককে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে টেনে এনে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রস্তুত করে তুলছিল তার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য। এই সময় কৃষক ও শ্রমিকদের অসংগঠিত অবস্থার বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্যে গণ-সংযোগের অপরিহার্যতায় গুরুত্ব আরোপের প্রবৃত্তি জাতীয় জীবনের এক মাহেন্দ্রমুহূর্ত বলা চলে। প্রগতিশীল এইসব চেতনার মিশ্রিত উপাদানগুলি কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলালের কণ্ঠেও ফুটে ওঠে।[30] এইসব রাজনৈতিক চিন্তাধারাগুলি বিভিন্নভাবে যুগসমস্যা ও যুগচেতনাকে প্রকাশ করে চলছিল যার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে জনমনে সঞ্চারিত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-এর বিরুদ্ধেও এই সময় থেকে গড়ে উঠতে থাকে প্রবল জনমত। ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব এসে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর, জাতীয় কংগ্রেসও তখন এসব ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা না গ্রহণ করে পারে নি।

১৮জুন, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গোর্কির মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলে বাংলাদেশের প্রগতিশীল লেখক সংঘের (তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত নয়) সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে ১১জুলাই, ১৯৩৬-এ এলবার্ট হলের কমিটি-রুমে শোকসভা পালিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক), কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (এডভান্স সম্পাদক), খগেন্দ্রনাথ সেন। নরেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁকে অনুসরণের শপথ গ্রহণ করে এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংঘের আনুষ্ঠানিক সভাপতি হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নাম ঘোষিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। সভার সভাপতি তাঁর অভিভাষণে (১) প্রগতিকামী লেখকদের সংঘবদ্ধ হতে, (২) বাংলাদেশে দমননীতির হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করতে, (৩) ক্রমবর্ধমান বিপদ প্রতিরোধের জন্যে প্রতিক্রিয়াবিরোধী চিন্তাধারা প্রচার ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সংকীর্ণতা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করে লেখকদের সংঘবদ্ধ হতে ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে, বিশ শতকের মধ্যভাগে রচিত সাহিত্যে মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিতে এবং অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করতে পরামর্শ দেন।[31]

এরপর সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর ২১ জুলাই(১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ)-এর বিবৃতিতে ৩১ জুলাই(১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ) দিনটিকে 'নিখিল ভারত গোর্কি দিবস' রূপে পালনের আহ্বান জানান। জনগণের জন্যে গোর্কির আজীবনের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি এই বিবৃতিতে সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে গোর্কির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে ভারতীয় প্রগতি লেখকগণের আন্দোলনের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশবিশেষ সে সম্পর্কে জহীরের নির্দ্বিধ স্বচ্ছ মন্তব্যটি স্মরণীয়। নানা কারণে ৩১ জুলাই-এর গোর্কিদিবস পালনের দিনটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। পরে এটি অনুষ্ঠিত হয় ১৬ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে। স্থান--কলকাতার আশুতোষ কলেজ। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের নেতৃত্বে ছিলেন সংঘের শাখা সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও 'মডার্ন রিভিয়ু' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ড. ডব্লু. এস. আর্কুহার্ট ও অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার বাণী প্রেরণ করেন। উপস্থিত অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন প্রমুখ। সভাপতি ড. সেনগুপ্ত গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনপ্রসঙ্গে বলেন, 'নিখিল ভারত ম্যাক্সিম গোর্কি দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতার সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের এই সভা জনগণের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও সাহিত্য শিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। মৃত মহাপুরুষ মুক্তি সংগ্রামে ও সংস্কৃতি প্রচারোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি ফ্যাসিজম ও যুদ্ধোদ্ভূত আক্রমণ হইতে মানব সভ্যতার রক্ষা কল্পে সকল প্রগতিবাদীকে একত্রীকরণের জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।'[62]

গোর্কিদিবস পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রগতি আন্দোলন একটি সুনির্দিষ্ট গতিশীলতা লাভ করে। ভারতবর্ষে আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের ওপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে উপলক্ষ করে যে সমস্ত বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধে তার প্রতিটিতে প্রগতি লেখক সংঘ অংশ গ্রহণ করে এবং মতাদর্শের দিক থেকে নিজেদের লক্ষ্য স্থির রাখে। ভারতে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ও শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনগণের আন্দোলনেও এই সংঘ যথাসম্ভব তার শক্তি নিয়োগ করে।

প্রসঙ্গত এ পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করা উচিত, যা আগেই আলোচনা করা উচিত ছিল। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষে কমিউনিস্টরা তথা বামপন্থীরা কি ধরনের রণনীতি গ্রহণ করবেন, তিমিট্রভের (ডিমিট্রভের) সিদ্ধান্ত (সপ্তম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেস) তার সংকেত ছিল, সেই সূত্রের ওপর নির্ভর করে রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে নতুন

দত্ত-ব্রাডলের এবং 'The Anti-Imperialist People's Front'[৬৬] শিরোনামে একটি সম্পূর্ণ থিসিস রচনা করেন। তাতে জাতীয় সংগ্রামের রণনীতি নির্ধারিত হয় এইভাবে:

'What of the situation in India? Since the abandonment of mass civil disobedience we see a confusion of forces and no powerful united movement of resistance to British imperialism, which rules with more triumphant reaction than ever.'

এসব আলোচিত হচ্ছে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের অধিবেশনের মাত্র কয়েক মাস আগে। এই থিসিসেই প্রস্তাবিত হয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা' বিস্তারের কথা, জোর দেওয়া হয়েছে শ্রমিক-কৃষকের 'স্বাধীন শ্রেণী কার্যভার'--এর ওপর। প্রতিটি ভারতীয় দেশপ্রেমিককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে---

'Every Indian patriot will recognise the first need for the successful advance of the Indian national struggle, the key need of the present situation, is unity of all the anti-imperialist forces in the common struggle. This is the indispensable condition for the successful fight against the existing and ever-sharpening reaction and oppression.'

থিসিসটিতে অসংশয়িতভাবে উপস্থাপিত হয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্টের কথা, তাদের সংগ্রামের কথা এবং ঐক্যগঠনের প্রস্তুতির কথা। বলা হয়:

'Much as we may desire to see unity of the whole Indian people in the struggle against foreign rule, we have to recognise that there cannot be an abstract 'unity' of the entire Indian population, 100 percent, all sections and classes, against British imperialism. Some sections have their interest bound up with imperialism, e.g., the princes, landlords, money lenders reactionary, religious and political elements which live on exploiting communal differences, elements among the merchants and wealthy classes who favour cooperation with imperialism, etc. ... and in consequence, in estimating the forces of the national struggle, we have to take into account the realities of the class-

structure of population under the conditions of imperialism.
'What is the necessary basis for such unity of all the anti-imperialist forces, anothers can unite all the forces of the National Congress, the trade unions, the peasants' organisations, the youth organisations, etc. on a common platform in a mighty common front?
'It is clear that the essential minimum basis for such a grouping is (1) a line of consistent struggle against imperialism and against the existing slave constitution, for the complete independence of India, (2) active struggle for the vital needs of the toiling masses.'

কমিউনিস্টদের রণকৌশল হিসেবে এইসব সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হচ্ছে, তখন আলাদা করে সাহিত্যের জন্যে বা সংস্কৃতির জন্যে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত সেখানে নেই, ডিমিট্রভের থিসিসে যদিও তা সংকেত আকারে উল্লিখিত। থিসিসটি সম্পূর্ণত রাজনৈতিক দলিল, সেই হেতু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আলাদা গুরুত্ব আরোপের প্রশ্ন সেখানে ওঠে নি। তবে এই থিসিস থেকে এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে এতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মতাদর্শের ঘোষণার প্রতি জোর দেওয়া।

যাই হোক, এই আদর্শের সূত্র ধরেই প্রগতি লেখক সংঘ তার পূর্ব নির্ধারিত রণকৌশল গ্রহণ করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁদের সাহিত্যচিন্তাগত মূল্যায়ন তথা দৃষ্টান্তগুলি এই পর্যায়ে বিশেষভাবে পর্যালোচ্য। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'প্রগতি' সংকলন। প্রাদেশিক সংঘ-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এই সাহিত্য সংকলনটি মার্কসীয় চিন্তাচর্চার প্রাথমিক প্রয়াসই শুধু নয়, সংঘবদ্ধ সচেতন প্রচেষ্টাও বটে, যাতে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের থেকে রসগ্রহণের প্রেরণা ও প্রণোদনাও সমানভাবে উৎসাহিত।

এই সংকলনে যাঁদের রচনা ঠাঁই পেয়েছে তাঁরা হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আঁদ্রে জিদ, ই.এম.ফর্স্টার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কার্ল মার্কস, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মিনা বসু, টি.এস. এলিয়ট, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণকুমার মিত্র, কারাবিয়েভ, অ্যালেকজান্ডার ব্লক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যারি পিটকের্ন, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। এ পর্বের প্রথম সাহিত্য চেষ্টায় যেমন স্মরণযোগ্য

প্রবন্ধগুলি, তেমনি দুর্বলতর দিক হল কবিতার ক্ষেত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রতিভা উল্লেখ করবার মত। সংকলনের 'মুখবন্ধে' সম্পাদকদ্বয় জানিয়েছেন, 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমরা এই সঙ্কলনের ভার নিয়েছিলাম। যাঁদের লেখা এতে আছে, তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্ঘের সভ্য, কয়েকজন সভ্য না হলেও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখেছেন ('লিখেছেন' হবে), তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে নির্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী, ফ্যাসিজম্ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, সংস্কৃতিকে খর্ব করছে বলে।'[৬৪]

এই ঘোষণায়, মনে রাখতে হবে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক ক্ষেত্রমাত্র ফ্যাসিজম-বিরোধী ও সমাজ-সচেতনতায়, অব্যক্ত রয়ে গেল শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় মতাদর্শের বৈপ্লবিক পথের কথা। এই অনুল্লেখ উপস্থিত কারণসংবলিত: ১) কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় বেআইনী, ২) যথাযথ নির্ভরতার অভাব, ৩) মিত্রদের যুক্তফ্রন্টীয় রণকৌশলের রীতিগ্রহণ। ফলে সংঘের যারা সভ্য নয় অথবা যারা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অন্য মতাবলম্বী কিন্তু প্রগতিশীল, প্রগতি লেখক সংঘ তাদেরও প্রাথমিক। পরে আমরা দেখব, এই দুর্বলতার পথ ধরে সংঘের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সদস্য কেমন করে সরে গেছেন। এই 'মুখবন্ধে' আরও জানানো হচ্ছে, 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ'---ন্যায্য অধিকারগুলি কি কি এ-বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখা হয় নি। অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কেও কোন আভাস নেই। এই গ্রন্থের গৌরব নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি 'ভূমিকা'।[৬৫] প্রথমত তিনি সংঘ সম্পর্কে অনেকের অস্পষ্ট ধারণা দূর করতে প্রয়াসী হয়ে সত্য কথাই স্বীকার করেছেন, 'সংঘ কি চায়, ইহার স্বরূপ কি, তার পরিপূর্ণ ধারণা ইহাতে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু একটা আভাস পাওয়া যাইবে।' বলাই বাহুল্য, এই সংকলন 'আভাস' মাত্র হলেও ঐতিহাসিক দলিলরূপে তা পরমাদরণীয়।

নরেশ সেনগুপ্ত সংঘের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত করে বলেছেন যে, সংঘ সাহিত্য ও সমাজে প্রগতিকামী, যে সাহিত্য সমাজের পরিপুষ্টির উপযোগী ও প্রগতিশীলতার অনুকূল, তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, 'সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না।' তিনি আরও মনে করেন যে, গতানুগতিকের বাঁধা খাত পরিত্যাগ না করলে সার্থক সৃষ্টি অথবা সেই সৃষ্টির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। মানবজীবন ও সমাজজীবনই প্রগতিশীল সাহিত্যের সঠিক উপাদান। আর 'চলিষ্ণু সমাজ ও মানব চিত্তের এই প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া যে সাহিত্যিক রস-রচনা করেন', তাঁর মতে, তিনিই সার্থক। প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ যে নিত্য---এই ধারণার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চান। 'প্রগতি'-র স্বরূপ বিশ্লেষণ করে

এই ভূমিকায় তিনি বলেন, 'প্রগতির একটা সাধারণ লক্ষণ চলিত-সংস্কার হইতে মুক্তি। যাহা কিছু চলিয়াছে তাহাই চিরদিন চলিবে, প্রগতিশীল সাহিত্যিক এ ধারণা রাখেন না। ভিন্ন ভিন্ন লেখক সংস্কারের ভিন্নভিন্ন অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ লক্ষণ সংস্কার-মুক্তি।'
প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ... 'যে-আদর্শই যাঁহার লক্ষ্য হউক, সে আদর্শের লক্ষণ ---স্বাধীনতা---ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতম স্বাধীনতা। যাহা কিছু মানবের মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের অন্তরায় তাহা বিদূরিত করিয়া মানবত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই স্বাধীনতা প্রগতি-সাহিত্য সঙ্ঘের লক্ষ্য।' তাঁর আরও অভিমত: 'মানব-সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতির যাহা কিছু অনুকূল, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাই প্রগতি সাহিত্য বলিয়া সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন।' পৃথিবীতে বিজ্ঞানের সহায়তায় কিছু মানুষ পীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। মানুষের মানবত্বকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে সব মানুষের সংহত প্রচেষ্টার দরকার। এই অশুভ ও অকল্যাণকর শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে তারাই 'যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মীতা, লেখনী যার শক্তিমান'। মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দুষ্ট অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই প্রগতি লেখক সংঘ। পরিশেষে সেনগুপ্ত মহাশয় একটি বহুল বিতর্কিত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সু-সাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই। সঙ্ঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সঙ্ঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি-সাহিত্যের সম্যক প্রচার, আলোচনা ও গবেষণা করিয়া পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্যে নিযুক্ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও ব্রত।'

বাস্তবিকপক্ষে সংঘের আদর্শ, লক্ষ্য ও ব্রতের মধ্যে স্পষ্টতর বক্তব্য প্রতিফলিত হয় নি, পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা করে শ্রীযুক্ত সুধী প্রধান তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ... 'প্রগতি' সংকলনের মার্কসবাদী সম্পাদকদ্বয় এবং সংঘের সভাপতির বক্তব্যের সুর প্রধানত ভারতের অবস্থার সঙ্গে না মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবে ফ্যাসিজম-বিরোধিতার সুর।'[৬৬] এদিক থেকে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধটি[৬৭] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এতে তিনি প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ কিছুটা উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। মার্কসবাদী আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মততার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, এ প্রবন্ধে তা যথাযথ না হলেও, তরল অর্থেও অনুসরণের চেষ্টাটুকু দেখা যায়।

তাঁর মতে, প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি হল বাস্তবতা। বাস্তবতাকে এড়িয়ে প্রগতি সাহিত্যের মধ্যে কল্পজগতের সম্ভাবনাকে তিনি একেবারে সরাসরি নস্যাৎ করেছেন। তবে স্বীকার করেছেন নরনারীর রুচিবোধকে, মূল্য দিয়েছেন শিল্পের রূপসৃষ্টির ওপর। মানুষ তার দৈনন্দিন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকবাসী হতে পারে না। তার কারণ এই সংসারে মানুষের মূল্য হারিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অর্থ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ধনীদের ক্রীতদাস। এই জীবনে বা সমাজে আনন্দ বা উৎসাহ কোথায়? তাছাড়া সম্প্রতি বলবতী হয়ে উঠেছে ফ্যাসিজমের আগ্রাসন নীতি যা মানুষের মুক্তিকে বহু বিলম্বিত করে তুলবে। প্রাচীন সাহিত্য বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে তাই বারবার শান্তি খুঁজেছে কল্পজগতে। বিজয়লাল বলেন, 'প্রগতি সাহিত্য দুঃখ থেকে মুক্তি চায়---কিন্তু সে মুক্তি বাস্তবের দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে নয়। শান্তির চেয়ে জীবনের প্রতি তার অনুরাগ বেশী। বাস্তবকে ভেঙে তাকে নূতন রূপ দিতে চায় সে।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, প্রগতি সাহিত্য হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকেন্দ্রিক: 'কার্ল মার্কস কথিত Classless Society -র এই অভিনব সমাজই হবে সাহিত্যের ভিত্তি।' তাঁর মতে, এর ফলে উদ্ঘাটিত হবে মানুষের নতুন রূপ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'প্রগতি'[৩৮] তে যুক্তিধর্মী বিজ্ঞানমনস্কতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একজন প্রগতিশীল লেখক তথ্য (facts), ঘটনা (events) ও মূল্য (values) কিভাবে যাচাই করে সাহিত্যে বিবেচনা করবেন সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনায় প্রগতিশীলতার লক্ষণ তিনি খুঁজে পান নি। তাঁর মন্তব্য: 'তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করেছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোনো বস্তু নতুন পাই নি। সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু-সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতনতার সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হল, কিভাবে হল---এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ...আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ফুটে বড় হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।'[৩৯] তিনি কবিতাসম্পর্কেও বিশেষ আশাবাদী নন, লক্ষ্য করেছেন, এর ভেতরকার রোমান্টিক বিলাসকে। চেয়েছেন এর থেকে মুক্তি।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ দেশে প্রথম মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারে অনেকটা সহযোগিতা করেন। 'সাহিত্যে প্রগতি'[৪০] প্রবন্ধে প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে: 'যে সাহিত্য সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া উন্নত অবস্থার দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দেয় সেই চেষ্টাকেই প্রগতি সাহিত্য বলা হয়।'[৪১] তিনি উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে সাহিত্য যে রস ও রূপ নিয়ে গঠিত হয় তা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ

যাতঃ ...'প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই রূপ ও রূপ নিয়া সংগঠিত হয় বটে, কিন্তু সেই রূপ ও রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ছাপ বহন করে। যাঁহারা Art for art's sake বলেন তাঁহারা একটা অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক কথার উল্লেখ করেন। ...রূপ ও রূপ অর্থাৎ Art প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি ভিন্ন সহিত বিজড়িত।'[৪২] তিনি মনে করেন, আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আবর্তন ও বিবর্তন ঘটে, মানুষের ভাব রাজ্যেও সেই পরিবর্তন সংসাধিত হয়, ইতিহাসে বা সাহিত্যে তারই ছায়া পড়ে। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োগের এটি একটি অন্যতম নমুনা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা'[৪৩] প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। তাহলেও প্রবন্ধটিতে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল বর্তমান সময়ের প্রতি আবেগের অতিরেক। তাঁর মতে, 'একমাত্র ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধের বর্বর উপদ্রব বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।'[৪৪] এই একদেশদর্শিতা প্রগতির চারিত্র্যলক্ষণগুলি সম্পর্কে সম্যক আলোচনার পরিপন্থী। তিনি এই প্রবন্ধে অবশ্য যথার্থই বলেছেন যে, সাহিত্যে কল্পনা অবাধ হলে তা সুস্থতার সীমা ছেড়ে বিকৃতির জন্ম দেয়, বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্য জন্ম দেয় সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যের। তাঁর ভাষায়: ...'সমাজের পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়, উৎপাদন ও বন্টনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনার অঙ্গুলি নির্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্বসংকেতরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার সুসংহতি ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের গতিপথের দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে পারে না। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরিণত ফল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাহিত্যিক কল্পনা উভয়েরই কাম্য।'[৪৫]

আলোচ্য সংকলনে আঁদ্রে জিদের 'ব্যক্তি ও সমষ্টি'[৪৬]-র অরুণকুমার মিত্র কৃত অনুবাদ, ই, এম, ফর্স্টারের 'ইংরেজ ও স্বাধীনতা'[৪৭]-র আবু সয়ীদ আইয়ুব কৃত অনুবাদ, কার্ল মার্কসের 'ভারতে ইংরেজ শাসন'[৪৮]-র হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

''প্রগতি' সংকলন উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। ৬ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এর প্রাপ্তি স্বীকার করে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে একটি পত্র দেন। (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে দেখতে পেয়েছিলেন 'নবজন্মের চাঞ্চল্য', দেখতে পেয়েছিলেন স্বদেশ আর বিদেশের ভেদরেখা মুছে যাওয়া আন্তর্জাতিকতাবাদের এক অভিনব চেহারা যা বস্তুতই নব যুগের নবধারার সূচনাঙ্কিত। পরবর্তী বছরে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনের সভাপতির পদ অলংকৃত করার অনুরোধ জানিয়ে কবিকে একটি চিঠি দেন। এখানে তা সম্পূর্ণত উদ্ধৃত হল:

২৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন

কলিকাতা
২৮। ১১।৩৮

বরণীয়েষু

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' বইখানা সম্পর্কে আপনার আশীর্বাদপত্র লাভ করবার পরে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, সঙ্ঘের শাখা নানা দিকে বিস্তার লাভ করায় ও আপনার আশীর্বাদে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এবার আমরা আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন আহ্বান করেছি। তাই আবার আমরা আপনার চরণে শরণাগত।

আমরা অবশ্য জানি যে আপনার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দেওয়া অপরাধের নামান্তর মাত্র, কারণ, আপনার স্বাস্থ্য কেবল আমাদের নয়, সমগ্র দেশের ও বিশ্বমানবের অমূল্য সম্পদ। আমরা কি জানি না যে আপনার লেখনীই উদ্ধত জাতীয়তার অন্ধ উপাসক জাপানী কবির উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের পক্ষে একমাত্র অবলম্বন? আমরা কি আরও জানি না যে বর্বরতার যূপকাষ্ঠে স্পেন, চীন ও চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বলিদানের বিরুদ্ধে আপনার উদাত্ত বজ্র নির্ঘোষই আমাদের সহায় ও ভরসা?

কিন্তু, তা সত্ত্বেও নিরুপায় আগ্রহে ও সসঙ্কোচে আপনার কাছে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন জানাচ্ছি। একান্ত অসম্ভব না হলেও, এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অধিবেশনের প্রারম্ভে আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ যদি কিছুক্ষণের জন্যেও সভাপতির আসন গ্রহণ করতে সম্মত হন, তাহলে নিখিল ভারতের সমস্ত সাহিত্যিক আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। আপনার অনুমতি পেলে ও আপনার পক্ষে সুবিধামত দিনে আপনার চরণবন্দনার সৌভাগ্যলাভের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করবার সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

আশীর্বাদপ্রার্থী

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। [৪৬]

পরদিন লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর মনোবেদনা ধরা পড়ে। (প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত)। কবির এই চিঠি থেকে অনুমান করা চলে যে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সর্ব ভারতীয় প্রগতি সম্মেলনের প্রাক্-পর্ব ছিল একটু জটিল, চক্রান্তপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যাঁরা যোগ্য উমেদার তাঁরা এইসব অনুষ্ঠানে উপযুক্ত পদমর্যাদা না পেলে তাঁকে অশান্তিতে ফেলবেন। এ কথার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। নামোল্লেখ করেন নি তিনি, সে তাঁর অসাধারণ সৌজন্যবোধ, কিন্তু সেই কারণেই ইতিহাস এখানে নীরব।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেন। এর প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেশে মুক্তি আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা প্যালেস্টাইনে এরকম এক মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল নেহরু এই মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পালিত হয় 'প্যালেস্টাইন দিবস'। 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে 'প্যালেস্টাইন ও স্পেন দিবস' পালনে উদ্যোগী হন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইলের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখার সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায় ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ঐক্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দেন। এই সময় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১মার্চ স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কলকাতার এলবার্ট হলে জনসভার আয়োজন করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সরোজিনী নাইডু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা দেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুনন্দা মজুমদার, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও জননেতা। এই সভায় 'স্পেন সাহায্য তহবিল' গঠন করা হয়। ১২ এপ্রিল, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় স্পেন সাহায্য কমিটি'র উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে 'স্পেন-সপ্তাহে'র প্রথম দিনটি পালিত হয় ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। সভায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

এরপর 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে-এর ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বরে, কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে 'আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে'। কবি রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি, কিন্তু একটি প্রবন্ধ পাঠান---এশিয়ার নবজাগরণের অন্যতম নায়ক জাপানপক্ষের প্রগতি উচ্চারণ করে। এই সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ, পণ্ডিত সুদর্শন, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই সম্মেলনে চারটি প্রস্তাব[৫০] গৃহীত হয়। এগুলি হল:

ক) সম্মেলনের মতে যাঁরা সংস্কৃতির উপাসক তাঁদের প্রধান কর্তব্য হবে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যেসব শক্তি সংগ্রাম করছে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং সাহিত্যের দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে ভারতীয় জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করা। কারণ, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের অধীন থাকা পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সম্ভব নয়, ভারতীয় জনগণের নিরক্ষরতা দূর করাও সম্ভব নয়। ভারতীয়

সাহিত্য যে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ তারও কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতে শোষণ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখা।

খ) ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেসব লেখক ও শিল্পী সংগ্রাম করছেন এবং এজন্যে দুঃখ বরণ করছেন, বিশেষ করে জার্মানি, ইটালি ও স্পেনে নির্যাতন ভোগ করছেন, সম্মেলনে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

গ) সম্মেলনের মতে, সাহিত্য ও শিল্প সমগ্র মানবসমাজেরই সম্পদ---তাকে জাতিগত বা সম্প্রদায়গতভাবে বিভাগ করা যায় না, এর সীমারেখাও নির্দেশ করা চলে না। ভারতের প্রগতিশীল লেখকগণ---সাম্য, স্বাধীনতা ও শান্তির ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন, সম্মেলন তাঁদের সর্বতোভাবে সমর্থন করেন।

ঘ) ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্প্রসারণ, বিদেশ থেকে প্রগতি সাহিত্য আমদানী সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক ইত্যাদিতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার প্রচার বন্ধের দাবিতে আরও দুটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

মানতেই হবে যে, উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলিতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কাজে লাগানো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্তরকম প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করা ও আহ্বান করা প্রচলিত ধারায় একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত।

সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মুলুকরাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের নরীন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁদের বক্তৃতা ও নিবন্ধ পাঠ করেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রগতিশীল সাহিত্যে পরানুগতিকতা পরিহারের পরামর্শ দেন ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। যে কারণে এই স্বাধীনতা বিপন্ন সেই অপশক্তি সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'Progress of man as I understand it, and I hope you all understand it, means a widening of his freedom. ... There is a big movement afoot that laughs at the notion of freedom, ... In this great crisis every resource of mankind must now be mobilised without delay...'[৫১]

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তও এই সম্মেলনে ভাষণ দেন। সুধীন্দ্রনাথ প্রগতি সাহিত্যিকদের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তসুলভ ভাবাবেগ বাদ দিয়ে জনগণের ওপর আস্থা জানাবার আহ্বান জানান:

'Not the introspecting intellectuals but the enduring masses are the guardians of tradition and dictators of progress; and whatever be the calibre of the experimentors unless he passes the pragmatic test of his people, the facts he would fondly establish are febrile dreams and the truths he would loudly proclaim are feeble fancies.'[৫২]

মুলকরাজ আনন্দ, সম্মেলনের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য তাঁর ভাষণে[৫৩] প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পশ্চাৎ-পটভূমি সবিস্তারে আলোচনা করেন। প্রগতি লেখক সংঘ ভারতে বৃহত্তর এক সংস্থা, যাতে অংশ গ্রহণ করেছেন এ দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবী, কিন্তু কিছু কিছু লেখক-শিল্পী বা দার্শনিক ধর্মীয় বা আদর্শঘটিত কারণে এই সংঘে এখনও যোগ দেন নি, তাঁরাও একটি সাধারণ লক্ষ্য সামনে রেখে, বিশেষ করে পুরাতন সংস্কৃতির উন্নতি, অতীতের সম্যক সমালোচনা ইত্যাদির সামনে লক্ষ্য রেখে তাঁরা এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। তাঁর ভাষায়:

'In the Progressive Writers' Association, therefore, we have the broadest organisation of the Intellectuals of India, the largest bloc of writers who, whatever the difference in their standpoints, what ever their contradictions of philosophical, religious and cultural belief, join for common actions, it in the defence of our old culture and the development, through a proper criticism of the past, of a new culture.

তিনি আরও বলেন, As writers of an oppressed country, as members of a generation which has actually seen the decay of capitalism suffered from the effects of a war of conquest completed long ago but still waged against us through the slow and insidious repression of our will to freedom, as men who have felt the necessity to rebuilt the social order, the scientific and objective exploration of the foundation of all belief becomes a duty.

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বলেন,

'The importance of regional languages and literature should be stressed...The development of minority cultures in Russia will give an example to our regionalists of how extensive literature can grow up in a very short time if we have faith in the organisms which we wish to create.'

সবশেষে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির নবনির্মাণ গুরুত্বের কথা বলেন। সাম্রাজ্যবাদ তথা তারই দোসর ফ্যাসিবাদ বা অতীতের সামন্ততান্ত্রিকতার বিরোধী পটভূমিতে লেখকরা তুলে ধরতে পারেন মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা: 'The task of building up a national culture out of the debris of the past, so that it takes root in the realities of the present, is only way by which we will take our place among those writers of the world who are facing with us the bitterest struggle in history - the struggle of the peoples of the world against Imperialism, its twin brother Fascism, its old aunts Feudalism, and all other aunts who refuse to let the new shoots of life from bursting into the future'.

সাজ্জাদ জহীর 'উর্দু সাহিত্যে বিপ্লবাত্মক কবিতা' নিবন্ধটি পাঠ করেন, বলেন, 'উর্দু সাহিত্যে বিপ্লবাত্মক কবিতা নূতন নয়। বিপ্লবের বাণী ভারতের সর্বত্র নিনাদিত হয়েছে, ---ভারতের প্রতি নগর ও পল্লী আজ 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর।' ......আমাদের বিপ্লবীরা...সকলেই ভারতের স্বাধীনতাহীনতার জ্বালায় জ্বলে মরছেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, কৃষক ও শ্রমিকের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা বিশেষ স্থান আছে। তাঁরা চান, ভারতের যুবকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। তাঁরা প্রায় সকলেই গত তিন বছর যাবৎ এইভাবে লিখে চলেছেন---যদিও অধিকাংশ লেখাই ভাবপ্রবণ। সুখের বিষয় যে তাঁদের অনেকেই জীবনের বাস্তব ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন।'[৩৪]

দ্বিতীয় অধিবেশনে ছিলেন বলরাজ সাহনী, আলী সর্দার জাফরী ও সুধীন্দ্র শর্মা, তাঁদের আলোচ্য ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য।

তৃতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ড. আব্দুল আলীম, পদ্মজা নাইডু, আহমদ আলি, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ এবং শ্রীহট্টের 'বলাকা'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাস। একটি স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন বুদ্ধদেব বসু। রচনার শিরোনাম: 'Bengali Literature To-day: Position of Modern Writer'।

দূরত্ব তা ভুল পথ হবে। কেননা এখনও পর্যন্ত খুব অল্পসংখ্যক লেখকদেরই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, কারণটা স্পষ্ট। আর যদি আমরা ওদের সম্পর্কে লিখি তাহলে আমাদের নীচে তাদের স্তরে দাঁড়িয়েই তাদের মত করে লিখতে হবে কেননা আমাদের মত দেশে যেখানে জনগণের জ্ঞানের মান খুবই অতীব নগণ্য, সেখানে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে। আর এই নীচে তাদের স্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে আমরা তাদের প্রতি এবং সেইসঙ্গে নিজেদের প্রতিও সুবিচার করব না। সে যাই-ই হোক, আবার নিজে কিন্তু আমরা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না,--তার জন্য আমাদের 'কাজ' করতে হবে।'... বুদ্ধদেব বসু পরিশেষে প্রগতি সাহিত্যিকদের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগের কথা বলেন: ...'সমস্যা ও আশু নজরের দিকে তাকিয়ে আসুন আমরা সমস্ত লেখকেরা মিলে প্রোপাগান্ডা বা প্রচারকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করি। কিন্তু এ কথা যেন না বলি যে, এইটাই হচ্ছে সাহিত্যের সর্বোচ্চ দিক বা আদর্শ এটা সাহিত্য। কেননা যদিও সমস্ত শিল্পকর্মই গভীর অর্থে প্রচারকার্য, সমস্ত প্রচারকার্যই কিন্তু শিল্পকর্ম বা আর্ট নয়।'[৫৬]...

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর প্রাগুক্ত মূল্যায়ন এ দেশের পত্র-পত্রিকায় তীব্র আলোড়ন আনে। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কবিকে লেখা পত্রে তাঁর নির্ভীকতার তথা ফ্যাসিবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী মানবিক ভূমিকার অকুণ্ঠ ও আন্তরিক প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য প্রকাশ পায় বুদ্ধদেব বসুর পঠিত রচনায়। অন্যত্র সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী অবশ্য মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে রবীন্দ্র-বিচারপ্রসঙ্গে বলেছেন--- 'Romanticism is born of a flight from reality and an idealisation of the past and the status quo and romanticism is the spring of Rabindranath's writings. Passive and intellectual contemplation as distinct from active participation in the processes that are changing society resulted in romanticism. The various tendencies in contemporary Bengali literature are, as could be expected, but divergent modes of reaction to his universal romanticism.'[৫৭]

এই মূল্যায়নে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারের চেষ্টা নেই। বুদ্ধদেব বসু এই বিতর্কের মুখে রবীন্দ্রনাথকে ২১,৫,১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এক পত্রে জানান: '...পত্রিকাটি আমি নিয়মিত দেখিনে, লোকমুখে শুনলুম ঐ পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছে যে, আমি নাকি এক বক্তৃতায় বলেছি বাংলা সাহিত্যের অধঃপতনের জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী। কথাটা এতই হাস্যকর যে, এর প্রতিবাদ করাও বৃথা---কাগজের রিপোর্টার-রা যে কখনো

যে-কোনো উক্তি কতটা মারাত্মক রকম বিকৃত হতে পারে এ-অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। তাছাড়া... কিছুদিন যাবৎই মস্ত হেডলাইন সহযোগে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে---ওরা যে-রকম অদ্ভুতভাবে আমাকে জনসমাজে উপস্থিত করে তা দেখলে আমার লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে করে। যা-ই হোক, করিমগঞ্জের সাহিত্যসভায় আমি যে প্রবন্ধটি পড়েছিলুম তার একটি কপি এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি---শ্রীহট্ট শহরে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা এই প্রবন্ধেরই সারাংশ। আমার একান্ত অনুরোধ এই আপনি দয়া ক'রে লেখাটির উপর একবার চোখ বুলোবেন---আধুনিক সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমি এতে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। শ্রীহট্টে আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম, 'রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করা খুবই সহজ,' বোধহয় সে-কথাই এখন বিকৃত হয়ে রটেছে।'[৫৮]

বোঝা যায়, বুদ্ধদেব বসু কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সম্মেলন ছাড়াও করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্টের সাহিত্য-সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'আধুনিক সাহিত্যিকের' দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করে কিছু মন্তব্য করেন। এর আশু প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত 'অগ্রণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর রচনাকে আক্রমণ করে লেখা সরোজকুমার দত্তের 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' রচনায়। এছাড়া 'পূর্বাশা' ও 'শনিবারের চিঠি'তে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক রচনা দেখা যায়।[৫৯]

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টিও তার গভীর শেকড় বিস্তৃত করে চলেছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে 'সমবেতভাবে সংযুক্ত' (collective affiliation)করার কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এর দুবছর পরেও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় নি। তাছাড়া কৃষক আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস, সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস অথবা বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির যে গুরুত্ব দেবার কথা, প্রতিশ্রুতি সেভাবে পালিত হয় নি। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সখেদে এ কথা স্বীকার করেছেন: 'প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিজীবী কৃষকের ভূমিকা কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরও যে স্পষ্ট ও শক্তিশালী হতে পারে নি তা থেকেই এ দেশের জনসংগ্রামের মূলগত দৌর্বল্য সূচিত।'[৬০] সাহিত্যে অথবা জীবনে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়।

তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা কংগ্রেসের ওপর বর্তেছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের নতুন সংবিধান অনুসারে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এগারটি প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস ও সাতটিতে অন্যান্যরা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করে। মন্ত্রীসভা গঠনবিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের ভিন্নমত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশে হক-মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দলগুলি এর ফলে জনগণ তথা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি যথাযথ ব্যবহারের

পরিবর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আধিপত্যকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব স্বশ্রেণীর পক্ষপাতী, সর্বদেশে, সর্বকালে, তবে কংগ্রেস বা অ-কংগ্রেসী সরকার কৃষক ও শ্রমিকের সরকার হয়ে উঠতে পারে নি। এর প্রমাণ মেলে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতায়। বাংলাদেশে এই ঘটনাটিই ঘটে।

এই সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরও দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান সামরিকশক্তির নির্মাণের প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতার কারণে বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ক্রমে জঙ্গী হয়ে উঠতে থাকে। ভারতে ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যে ধর্মঘটগুলি হয় তার পেছনে সামরিক উত্তেজনা অনেকখানি দায়ী। এই সময়, ভারতবর্ষে রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এগুলির সদস্য সংখ্যাও। বৃদ্ধি পায় ধর্মঘট আর বিনষ্ট হয় প্রচুর শ্রমদিবস। প্রসঙ্গত সুকোমল সেন-কৃত দুটি তালিকা[৬১] এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে:

ক) রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ১৯৩৭-৩৯

বৎসর	রেজিস্ট্রীকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের রিটার্ন অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা
১৯৩৬-৩৭	২৭১	২, ৬১, ০৪৭
১৯৩৭-৩৮	৪২০	৩, ৯০, ১১২
১৯৩৮-৩৯	৫৬২	৩, ৯৯, ১৫৯

এ প্রসঙ্গে শ্রী সেনের মন্তব্য এরকম যে, উল্লিখিত রেজিস্ট্রীকৃত ইউনিয়নগুলি ছাড়াও আরও বহু সংখ্যক ইউনিয়ন ছিল যা রেজিস্ট্রীকৃত নয়, এগুলি সংঘবদ্ধভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হত।

খ) শ্রমবিরোধের সংখ্যা ১৯৩৭-৩৯

বৎসর	শ্রমবিরোধের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা
১৯৩৭	৩৭৯	৬,৪৭,৮০১	৮৯,৮২,২৫৭
১৯৩৮	৩৯৯	৪,০১,০৭৫	৯১,৯৮,৭০৮
১৯৩৯	৪০৬	৪,০৯,০৭৫	৪৯,৯২,৭৯৫

প্রসঙ্গত সুকোমল সেন আরও জানিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-বিরোধের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বহুসংখ্যক শ্রমিক এইসব ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু লক্ষ্য করবার যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমদিবসের সংখ্যা বেশ কমে যায়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটের সংখ্যা ৩৭৯; ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের পর এত অধিক সংখ্যায় ধর্মঘট আর হয় নি।

মতান্তরে, এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী মজুরের সংখ্যা ছিল ৬লক্ষ ৭৬ হাজার।[৬২] এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলার চটকল ধর্মঘট যাতে সর্বসাকুল্যে ২লক্ষ ২৫ হাজার চটকল মজুর অংশগ্রহণ করেন। কর্তিত মজুরির পুনর্বহাল ও উপযুক্ত মজুরির দাবির সপক্ষে এই ধর্মঘট। ফজলুল হক ও তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা জানালেন যে এই আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ছিল না, বরং ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি কমিউনিস্টদের কারসাজি।[৬৩] মালিকপক্ষ বাধ্য হয়েছিলেন শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আমেদাবাদ ও কানপুরেও শ্রমিক আন্দোলনে তীব্রতা সঞ্চারিত হয় যার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে মালিক-শ্রমিক বিরোধ আইনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে বোম্বেতে ৯০ হাজার শ্রমিকের প্রতিবাদ ধর্মঘট। ঐ আইনে সালিশীর সাহায্যে ধর্মঘটের অধিকার ভারসাম্য বিলম্বিত করার ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন রেজেস্ট্রিকৃত করার ব্যাপারে বিধিবিধানের আমদানী করে কোম্পানীর তৈরি ইউনিয়নকেই সুবিধা দেওয়া হয়। শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার এক বলিষ্ঠ নিদর্শন। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসমূহ সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করার জন্য ঐ ধর্মঘট বোম্বাই কংগ্রেস গভর্নমেন্টের প্রতি এক সতর্কবাণীও বটে।[৬৪] এক মাস ধরে ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার নাগপুর ধর্মঘটে সামিল হয়, রেলওয়ে শ্রমিকদের এই ধর্মঘট কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সহানুভূতি লাভ করে। এই সমস্ত ঘটনা জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার উদ্বোধনে সহায়ক মাত্রই শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারও সহায়ক হিসেবে গণ্য হয়েছিল সে সময়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ৩০ অক্টোবর সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩লক্ষ ২৫ হাজার। রজনীপাম দত্তের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য অনস্বীকার্য: 'সাম্রাজ্যবাদের অনাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় দাবীর সমর্থনে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের এক শক্তিশালী ও সংগঠিত অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'[৬৫]

শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তর থেকেও প্রায়শ পরিচালিত ও সমর্থিত হয়েছে। এলাহাবাদে (২৬-২৯ এপ্রিল, ১৯৩৭) কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কুটকর্মীদের সহানুভূতি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬৬] জাতীয় কংগ্রেসের তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃশ্যপট বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করে চলেছিল। অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উপর জাপান-এর বর্বর আক্রমণ ও অ-সামরিক অধিবাসীদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে জাতীয় কংগ্রেস কলকাতার অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে চীনের জনগণের সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে জাপানী পণ্য বর্জনের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাঃ বেনেসের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় এই মর্মে জানানো হয় যে, স্বাধীনতা রক্ষার মহান সংগ্রামে চেক-জনগণের সাহসিকতাপূর্ণ এই লড়াই অভিনন্দনযোগ্য। পরের বছর, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির নিন্দা করা হয়। কেননা জার্মানি, স্পেন ও দূর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্টদের তারা সমর্থন করে চলেছে এবং যুদ্ধের অনিবার্য পরিস্থিতিকে ঘনিয়ে তুলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, পণ্ডিত নেহরু ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় জাতীয় কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবকে তুলে ধরেন। তিনি স্পেনে যান এবং বার্সিলোনা পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের যুদ্ধরত মার্কিন ও ব্রিটিশ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে ছিলেন অপর সদস্য ভি. কে. কৃষ্ণমেনন। মেনন তখন ছিলেন লন্ডনের 'ইন্ডিয়া লীগ' ও 'স্পেন-ভারত কমিটি'র সভাপতি। এর আগে এগনেস স্মেডলি ও চীনের সুং চিং লিং-এর উদ্যোগক্রমে চীনের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর প্রধান চু তে মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর অনুরোধ করে জওহরলালকে একটি পত্র দেন---এটি 'চীনের আবেদন' শিরোনামে মডার্ন ট্রিবিউনে প্রকাশিত হয়---

General Head-Quarters
Eighth Route Army
Shanshi, China
Nov. 26.

Dear Mr. Nehru,

We here in China have read in news dispatches that you called mass meetings in a number of Indian cities in support of our war of liberation. Allow me to thank you in the name of the Chinese people and in the name of the Eighth Route Army (the Chinese Red Army) in particular.

You know that the Japanese have occupied many cities and our main railways in China. Our Eighth Route Army, the revolutionary army of the Chinese masses, is organizing and arming the people for prolonged warfare that will end in ultimate victory and liberation for us. This work of ours is difficult because we are a poor army. We are able to help the peasant partisans wherever we operate

throughout the north, and they are rapidly becoming an organic part of our army. But there is one problem that we cannot solve, and of this that I write you now.

'If the Japanese were successful in subjecting China, none of the peoples of Asia could gain their liberation for many years and perhaps decades. Our struggle is your struggle.

Once more our Army thanks you from the depths of our heart for all you have so far done on behalf of our country.

In Comradeship,

CHU TEH
Commander-in-Chief of the
Eighth Route Army of China'.[৬৭]

চিঠিটির তারিখ ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৭। জওহরলাল নেহরু ৯ জানুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখটিতে 'চীন দিবস' পালনের আহ্বান জানান। 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর সম্পাদক এর সঙ্গে যুক্ত আবেদনে জানান--

'The 9th of January, 1938, has been appointed the "China day" by Pandit Jawaharlal Nehru, and we hope that, helpless and poor as we are, the response will be substantial. The passing of China would indeed be the end of peace and security in the old world, which would then be a field traversed solely and entirely by predatory nations — young and old.'[৬৮]

চু তে-র পত্র পাওয়ার পর তা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচিত হয় এবং হরিপুরা কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) চীনে মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রস্তাবানুসারে জাতীয় কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় 'চায়না এইড কমিটি'। এই কমিটির সম্পাদক হন জি. পি. হাথী সিং, অন্যান্য সদস্য হলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু আর ডাঃ জীবরাজ মেহতা। লণ্ডনে 'চায়না এইড কমিটি'-র যে শাখা স্থাপিত হয় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কৃষ্ণ মেনন, ড্যানিয়েল রফিক, মোহন কুমারমঙ্গলম,

এন. কে. কৃষ্ণান। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্র ইউনিয়নগুলি দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি ও নাটক মঞ্চস্থ করে অর্থ, ওষুধ-পত্র ইত্যাদি সংগ্রহে এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এই মেডিক্যাল মিশনে ছিলেন সর্বশ্রী ডাঃ মদন মোহন লাল অটল, প্রধান নেতা, ডাঃ মোরেশ্বর রামচন্দ্র চোলকার, সহকারী নেতা, ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস, সদস্য, ডাঃ বিজয়কুমার বসু, সদস্য, ডাঃ দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য। বিজয়কুমার বসুর আগে মনোনীত হয়েছিলেন ডাঃ রণেন সেন, কিন্তু পুলিশের খাতায় তাঁকে 'ভীষণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী' মনে করে, এবং 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হিংসাত্মক কৃষক বিপ্লবের নীতি অনুযায়ী বিপ্লবী কৃষক কমিটি গঠনের নীতিতে বিশ্বাসী' বলে তাঁর যাত্রায় বাধা দেওয়া হয়। তার এই বাধা আসে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, এস. বি. কলকাতা।[৬৯] ১৪ আগস্ট, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ডাঃ রণেন সেন ও ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'ভারতের দূতরূপেই এই পাঁচজন ডাক্তার চীনে যাচ্ছেন, তাঁরা চীনের দুর্দিনে ভারতীয়দের সহানুভূতি জ্ঞাপন করবেন।' তিনি আরও বলেন, 'এই প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে একটি মিশন পাঠাচ্ছে। ... পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে, ভারত উদারভাবে সেই জাতির প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। মেডিক্যাল মিশনের এই সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়েরা তাঁদের সেবা ও আত্মদানের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতের স্থান ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।'[৭০] ১সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজপুতানা' নামক জাহাজে বোম্বে বন্দর থেকে চীনের উদ্দেশে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন রওনা দেয়। যাত্রার আগে ডাঃ অটল একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।[৭১]

একদিকে শ্রমিক-কৃষকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শ্রেণীচেতনাভিত্তিক গণসংগ্রামের প্রস্তুতি, অন্যদিকে কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের ক্রমবিকাশ---ভারতবর্ষের পটভূমিকে নানাদিক থেকে গণমুখী করে তুলছিল। অনিবার্য ছিল এর প্রয়োজন---বাইরের দিক থেকে অথবা ভেতরের দিক থেকে। এর মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলতে হচ্ছিল বেআইনী-ঘোষিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে। বিশেষত বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে সমান্তরালভাবে দুটির একটি গুপ্ত, অন্যটি প্রকাশ্য গ্রুপ কাজ করতে থাকে।[৭২] একটিতে রণেন সেন প্রমুখ, অন্যটিতে নীহারেন্দু দত্তমজুমদার প্রমুখ।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে ব্যাপকতা লাভ করে। বন্দীদের নিজের নিজের প্রদেশে রাখা হোক এই দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। লীগ মন্ত্রীসভা এটা নিয়ে একটু বিপাকে পড়ে এবং মুসলমান নেতা শহীদ সুরাওয়ার্দির নেতৃত্বে পাল্টা মিছিল ও শ্লোগান শুরু হয়। অবশ্য এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ আগেই লেগেছিল। যাই হোক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রসঙ্গটি নিয়ে ভোটাভুটি হলে (বন্দীমুক্তির ওপর লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব) কংগ্রেস পরাজিত হয়। পরে বঙ্গপ্রদেশে বন্দীমুক্তি কমিটি

গঠিত হয় যাতে শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া কমিউনিস্টদের তরফ থেকে ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বঙ্গীয় ছাত্রফেডারেশন যা মূলত কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত। এ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এই আন্দোলনে শামিল হয়।

একসময় আন্দামান সেলুলার জেল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সূতিকাগার হয়ে উঠেছিল। জেলে কিভাবে আন্তর্জাতিক খবরাখবর সংগ্রহ করা হত, কিভাবে মার্কসবাদচর্চায় নিবিষ্ট হয়ে ওঠেন কিছু বিপ্লবী, সে সম্পর্কে চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বিপ্লবী নলিনী দাস। তিনি লিখেছেন: '১৯৩০-৩১সালে ধরা পড়ে আমরা বিপ্লববাদীরা যখন জেলে গেলাম---তখন ফ্যাসিবাদ কেন, সাম্রাজ্যবাদ কথাটারও সঠিক মানে বুঝতাম না। আমরা বুঝতাম আমাদের শত্রু বিদেশী ইংরেজ রাজত্ব, তারা শোষক ও লুণ্ঠনকারী। তাদের তাড়াতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করতে হবে। আন্দামানে দ্বীপান্তরে যখন গেলাম, তখনও এই রকমই মনোভাব।

আন্দামানেই প্রথম শুরু হল সব কিছু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা।'...

এই জেলে তিনজনের আত্মাহুতির বিনিময়ে খবরের কাগজ, পত্রিকা, বই---দেশি বা বিদেশি, আসতে শুরু করে। তিনি লিখেছেন যে, তিরিশের দশকের সবচেয়ে বড় ঘটনা যা তাঁদের মনকে সবচেয়ে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল 'তা হল ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো ও তার সমর্থক ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণ, তাদের পপুলার ফ্রন্ট সরকার ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বীরত্বপূর্ণ লড়াই।' নলিনী দাস তাঁর এই মূল্যবান স্মৃতিকথায় আরও জানান: 'প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা জেলে একটি ছোট প্রাচীরপত্র বের করতাম। নাম ছিল 'আন্দামান বুলেটিন'। তাতে আমরা নিয়মিত স্পেনের খবর দিতাম, মাদ্রিদ কী অসমসাহসী বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করছে, সারা পৃথিবীর সেরা বিপ্লবীরা আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের নামে এসে স্পেনের মাটিতে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে---এইসব। কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে। জওহরলাল নেহরু বার্সিলোনাতে রণক্ষেত্রে গিয়ে স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের সৌহার্দ্য জানিয়ে আসেন। আমরা তাতে খুব উল্লসিত বোধ করি। দু-চার টাকা করে যে যা পারি জমিয়ে শতাধিক টাকা পাঠিয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু পরিচালিত 'স্পেন সাহায্য তহবিল'-এ। আবার যেদিন পাকাপাকিভাবে খবর এল যে ফ্যাসিস্ট দস্যুরা বার্সিলোনা শহর দখল করে নিয়েছে, সেদিন আমাদের সকলের চোখেমুখে শোকের ছায়া। খেতে পারলাম না কেউ কিছুই। পুলিশের শত অত্যাচারেও যেসব বিপ্লবীদের মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোয় নি, তাদেরও চোখে সেদিন জলের ধারা। বার্সিলোনার পতন যেন কারাগারের মধ্যে থেকে কোনও পরমাত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার মতো।'[৭৬]

একজন ভারতীয় বিপ্লবীর কাছে এইভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাক্রম কমিউনিস্টদের ভাবধারার প্রতি আকর্ষণের

সেতু হয়ে ওঠে। এ যে শুধুমাত্র নলিনী দাস আর হিমাংশু ভট্টাচার্যের[৭৪] ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, জেলে অনেকেরই মার্কসবাদে দীক্ষা হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পর একের পর এক এসে কমিউনিস্ট পার্টি তথা তার সাংস্কৃতিক বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত হন গোপাল হালদার, সুখী প্রধান প্রমুখ। ১৯৩৭-৩৮-এ এসে যোগ দেন চিন্মোহন সেহানবীশও।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর বাংলাদেশে তেমন বড় কোন ঘটনা নেই যার দ্বারা প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ লাভবান হয়েছে। সাহিত্য, সেদিক থেকে একেবারে পিছিয়েও থাকে নি, কয়েকটি সাধারণ ঘটনা ছাড়া। যেমন, মনোরঞ্জন হাজরা কৃষকসংগ্রামকে মূলধন করে 'নোঙরহীন নৌকা' (প্রকাশকাল ১৯৩৭-৩৮), বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে মার্কসীয় চেতনায় উত্তরণের কাহিনীকে নিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন 'একদা' (প্রকাশকাল ১৯৩৯) ইত্যাদি কয়েকটি উপন্যাস মননশীল পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছিল সংগ্রামীজীবনের বাস্তবিকতা দিয়ে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মীর উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকে 'অরণি' নামের পত্রিকা। পূর্ববঙ্গও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার ও বিশিষ্ট কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন: '১৯৩৯ সনের পূর্বেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণার সূত্রপাত হয়েছিল। বৃটিশ কারাগারগুলোতে যেসব রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকেন এবং জেলের বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবন্ত প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সক্রিয় অংশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। এঁদের মধ্যে যেমন পুরোপুরি কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক লেখক ছিলেন তেমনি অকমিউনিস্ট, সাধারণভাবে মানবতাবাদী বা সোশ্যালিস্ট লেখকও ছিলেন। এইসব লেখকদের সহায়তায় ঢাকায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ স্থাপিত হয় ১৯৩৯ সনেই।'[৭৫] শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত খুব সম্ভব দুর্বল স্মৃতির জন্যে সংঘের নামকরণে ভুল করেছেন। আসলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে ওঠে আরও পরে, অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে। শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন যে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা শ্রীহট্ট ও ঢাকার বাইরে বিস্তৃত ছিল না। বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে। তিনি লিখেছেন, 'পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা। প্রধানত সেখানেই লেখকরা সংগঠিতভাবে এই ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সভার মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্ট ছাড়া জেলার বাইরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাক্ষর তেমন পাওয়া যায়

না।'[৭৬] অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জনৈক লেখক জানিয়েছেন যে, ঢাকায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের নেপথ্য ভূমিকা হল 'প্রগতি পাঠাগারের' এবং এরই ক্রমরূপে সংঘের শাখা স্থাপিত হয় ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে। তিনি আরও লিখেছেন,'আনুষ্ঠানিকভাবে তখনো সংগঠনটি প্রকাশ করা হয় নি।অবশেষে তরুণ লেখকদের মানসিক বিকাশ একটা বিশেষ পর্যায়ে আসার পর ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল।পুরনো ঢাকার সেন্ট গ্রিগরী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে খুব জাঁকজমকের সাথে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।সভাপতিত্ব করেন সেকালের মুসলমান সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ।প্রথম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হলেন রণেশ দাশগুপ্ত।'[৭৭] এঁদেরই উদ্যোগে প্রতি রবিবার যে সাহিত্যসভা বসত,সেই সভায় রীতিমত একটি ঘোষণাপত্রও তৈরি করা হয় সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী উল্লেখ করে।তাঁর মতে, এটি অনুসরণ করে চলতে লেখকেরা বাধ্য ছিলেন।প্রসঙ্গত তিনি শ্রী অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতিকথা উদ্ধার করেছেন---'সংঘের সভ্যরা বিশ্বাস করতেন যে মানবসমাজ ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে যাচ্ছে, এই অগ্রপথের পন্থা হল অত্যাচার উৎপীড়ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।আমরা সাহিত্য শুধু বাস্তবধর্মী হলেই খুশী হতাম না,আশা করতাম তার মধ্যে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ থাকবে।বলা বাহুল্য এই আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করা সহজ নয়।কারণ কোন বাস্তববাদী কাহিনী তার ধর্মানুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বর্তমান বা নির্দিষ্ট অতীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ।সীমাকে বজায় রেখেও তার মধ্যে ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়া সহজ নয়।কাহিনী কোন স্থূল বক্তৃতা বা নীতি উপদেশমূলক পরিসমাপ্তি দিলে আবার তার রসাবেদন ব্যাহত হয়।আবার সেই সময়ে আদর্শ অনুযায়ী সার্থক গল্প লেখা যেমন কঠিন ছিল তেমনি নতুন উৎসাহের আতিশয্যে সমালোচনাতেও আমরা নিরংকুশ ছিলাম।ভদ্রতার বালাই আমাদের ছিল না।কারণ লেখার কোন খুঁত বার করতে পারলে আমরা তাকে তুলোধোনা না করে রেহাই দিতাম না।'[৭৮]

১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দের পটভূমিতে কেবলমাত্র কলকাতা নগরীতে নয়,কলকাতার বাইরে, ঢাকা শহরেও,প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রতি সোচ্চার না হলেও, নিঃশব্দ আলোড়ন তুলেছিল যা এই আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম একটি উজ্জ্বল অধ্যায়বিশেষ।

পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসেও এই সময়,অর্থাৎ ১৯৩৮ ও ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটে। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বাম-শিবিরভুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু।হরিপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশনে(ফেব্রুয়ারী,১৯-২১,১৯৩৮)তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা কিষাণসভার মত সংস্থাগুলিকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যাবার পরামর্শ দেন।সেইসঙ্গে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে

দেন তাঁর অভিমত: 'My own view is that we can not abolish such organizations by ignoring or condemning them.'[৭৯]

মনে রাখা দরকার যে, বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভিন্ন ভিন্ন নামে, বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণমুখী হয়ে উঠছিল। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে এইসব সংস্থার হস্তান্তরকরণে যে সুফল ফলবার সম্ভাবনা ছিল এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত দূরদর্শিতা থাকতে পারে। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে থেকেই কমিউনিস্ট, সি. এস. পি. ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন, এর প্রমাণ যথেষ্ট। প্রসঙ্গত রণেন সেনের সাক্ষ্য অসংশয়ে স্মরণ করা যেতে পারে।[৮০] এ. আই. সি. সি-র সভ্য হিসেবে ঐ সময় নির্বাচিত হয়েছিলেন নীহারেন্দু দত্তমজুমদার(লেবার পার্টি), বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ। ডাঃ রণেন সেন এই পর্বের সার-সংক্ষেপ করেছেন তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে, যা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়: ক) 'সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টির প্রভাব, প্রচার ও সংগঠন বৃদ্ধি, খ) সি. এস. পি-র সুভাষবাবুর সহায়তায় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের প্রচণ্ড প্রভাব। নেহরুর অবদানও কম নয় এ ব্যাপারে যদিও গান্ধীজীর প্রভাবে তিনি বেশ দোদুল্যমানতার পরিচয় বারবার দিয়েছেন, গ)দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন কংগ্রেসের ভিতরেও প্রভাব বিস্তার করে, ঘ)অন্যদিকে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার।[৮১] এই মুসলিম লীগ ও তদানীন্তন অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে ১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধা বৈঠকে (ডিসেম্বর, ১১-১৬, ১৯৩৮) এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করতে হয়: 'Article V(c) reads : "No person who is a member of any elected Congress Committee shall be a member of any similar Committee of a communal organisation, the object or programme of which involves political activities which are in the opinion of the Working Committee, anti-national and in conflict with those of the Congress.'[৮২]

মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভা সম্পর্কেই বস্তুত এই সাবধানবাণী।

পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দ) 'পন্থ-প্রস্তাব'[৮৩]-কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক-কন্টকিত পরিস্থিতির আবর্ত সৃষ্টি হয় তাতে করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর শ্রেণীচরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট ও কিছু বামগোষ্ঠী তথা সুভাষ-সমর্থকরা পন্থ-প্রস্তাব এ. আই. সি. সি-র বৈঠকে প্রকাশ্য আলোচনায় বিরোধিতা করে এবং নির্বাচনে(সাবজেক্টস কমিটিতে) তাঁদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে যার ফলে

প্রস্তাবটি ২১৮-১০৫ ভোটে গৃহীত হয়। তারপর আরও গভীর হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণটি পাঠ করার পর।[৮৪] এই ভাষণে তিনি ব্রিটিশ শাসককে 'চরম পত্র'[৮৫] দেবার দাবি উত্থাপন করেন ও মাননীয় সদস্যবর্গকে তা বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ জানান। বলাই বাহুল্য, এই চরম পত্র দেবার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি[৮৬] ও দক্ষিণপন্থী আপোষকামী নেতারা তীব্র বিরোধিতা করেন। এঁদের অন্যতম জওহরলাল নেহরু। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন কমিউনিস্ট পার্টি, 'রায়পন্থী', নীহারেন্দু দত্তমজুমদার-এর 'লেবার পার্টি', কিষাণ সভা প্রভৃতি। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনপ্রসঙ্গে রণেন সেন লিখেছেন, 'ত্রিপুরীতে পার্টির পলিট-ব্যুরো বৈঠকে ঠিক হল যে আমরা নিরপেক্ষ থাকব, কেননা পরিণতি ভাঙনের দিকে। সি. পি-র কয়েকজন সভ্য পি. বি-র সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করায় উপস্থিত সি. পি সভ্যদের সভা ডাকা হল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে শুনেছি যে, সি. পি. অধিক ভোটে ঠিক করে যে সুভাষবাবুকেই সমর্থন করা হোক। করাও হল তাই।'[৮৭]

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র এরপর দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হন এবং পরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নিজস্ব দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। জাতীয় আন্দোলনে আপোষবিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে, বাস্তবিক, সুভাষচন্দ্র যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর অপসারণে সেই আন্দোলন বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এতকাল কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রচারী এই বাম-মনোভাবকে স্বাগত জানিয়ে এসেছে, কেননা, এই চেতনা সচেতন শ্রমিকশ্রেণী তথা বৃহত্তর অর্থে ভারতের নব-উদীয়মান প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর ভূমিকার দ্বারা জারিত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেসকেই বুঝত তখন তার নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চ মনে করত। এই দল, তাদের মতে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাভাবিক নেতৃত্বগ্রহণকারী। লেনিন বলেছেন যে, প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে বুর্জোয়াশ্রেণী। তিনি লিখেছেন, 'প্রত্যেকটি নির্যাতিত দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদান থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, ততক্ষণ সব সময়েই প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং অন্যের চেয়ে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কসবাদীরা তার পক্ষে থাকবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের রাস্তা বেছে নেবে সে ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।'[৮৮] এটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টের দ্বিতীয় কংগ্রেসের বক্তব্য। এই বক্তব্যই প্রায় সংশোধনহীন অবস্থায় ষষ্ঠ কংগ্রেসেও উচ্চারিত হয়, বলা হয়, 'লেনিন কর্তৃক প্রণীত ও দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত থিসিস' পূর্ণরূপে সিদ্ধ এবং তা কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পরবর্তী কার্যকলাপের নিয়ামকরূপে কাজ করবে।'[৮৯] এই কংগ্রেসে ঘোষিত হয়---'সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন চীন, ভারত ও অন্যান্য সকল ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের মেহনতী মানুষদের জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাধান্যের স্তর এড়িয়ে, এমনকি সাধারণভাবে পুঁজিবাদী

সম্পর্কসমূহের বিকাশের স্তরকেও এড়িয়ে একটি সুনির্ভর, মুক্ত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।'[৩০] বস্তুতপক্ষে, বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে দুটি ঝোঁক ক্রিয়াশীল ছিল তা হল ক) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও খ) বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কার্যক্রম। লেনিন জানতেন যে, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সর্বত্র সমপ্রকৃতির হতে পারে না। কেননা, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন শ্রেণী, সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা আলাদা, প্রয়োগ ও পদ্ধতির ব্যবহারও বিভিন্ন। কিন্তু তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে এদের সকলের আক্রমণের লক্ষ্য ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অর্থাৎ নিপীড়িত ও শোষিত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদের একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিক আছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সামাজিকশ্রেণীর আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা মত-বিরোধ সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে, মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানভূমিতে, ঐক্যের অনিবার্য যথার্থ চরিত্র পায়। কমিন্টার্নের কংগ্রেসে লেনিনের বক্তব্যকে তাই যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত বক্তব্য করা হয়। এই কংগ্রেস স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলে; 'চীন, ভারত ও অন্যান্য নির্যাতিত দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সম্ভাবনা বিবেচনা করে কংগ্রেস বলে যে, এসব দেশের বিপ্লবী আন্দোলন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্তরে রয়েছে। উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে।' এই কংগ্রেসে জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়াদের ভূমিকা নিরূপণ করে বলা হয় যে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সকলেই একই মনোভাব পোষণ করে না। এসব বুর্জোয়ার একাংশ প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে এবং জাতিবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করছে। 'স্থানীয় বুর্জোয়াদের বাকি অংশ, বিশেষত স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ প্রতিনিধিত্বকারী অংশ, জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করে এবং অস্থির আপোষ-মুখী প্রবণতা প্রদর্শন করে——যে প্রবণতাকে জাতীয়-সংস্কারবাদও(অথবা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসের ভাষায় 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' প্রবণতা) বলা যেতে পারে।' এক্ষেত্রে বলা হয় যে, বুর্জোয়া জাতীয়-সংস্কারবাদের গুরুত্ব ছোট করে দেখলে, তার ফলে কমিউনিস্টরা মেহনতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বুর্জোয়া জাতীয়-সংস্কারবাদের প্রভাব সাধারণত পড়ে থাকে পেটিবুর্জোয়া, কৃষকসমাজ ও শ্রমিকশ্রেণীর এক বিশিষ্ট অংশের ওপর। অন্যদিকে, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে এরকম প্রভাবের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রস্তাবে আরও বলা হয়: 'ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদী-সামন্ততান্ত্রিক শাসক জোটের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া অপোজিশনের বিক্ষোভ——এমনকি, তার গভীর কোন চরিত্র না থাকলেও——ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের রাজনৈতিক জাগরণের প্রক্রিয়ার উপর এক বিশেষ ধরনের উৎসাহবর্ধক প্রভাব ফেলতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয়-সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের সুনির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিরোধ——

যদিও এদিকে সেসব বিদ্রোহের তাৎপর্য খুব কম——কোন কোন অবস্থায়, পরোক্ষভাবে, গুরুতর বিপ্লবী গণ-আন্দোলন সূচনারও কারণস্বরূপ হতে পারে।' এই কথাগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হয় যে ষষ্ঠ কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক প্রশ্নসংক্রান্ত থিসিসে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রণকৌশল, নীতি তথা বুর্জোয়া-চরিত্রের মূল্যায়নে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তা একেবারে ত্রুটি মুক্ত ছিল না। বলা হয়েছিল যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা তাৎপর্যময় নয়। প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী শিবির ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার জোটগঠনের প্রস্তাব। কমিউনিস্ট গ্রুপের ঐক্যবিধান ও একটি স্বাধীন ও কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠনের ওপর জোর দিয়ে ভারতবর্ষে সচেতনতা বাড়াবার পরামর্শ দেয় এই কংগ্রেস। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্তর্জাতিকের ব্রাসেলস কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করা হয়েছিল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে তখন অনেকখানি অগ্রচারী হয়েও ভারতবর্ষের কাছে এধরনের নির্দেশ বস্তুত সুবিধাবাদী ও গোষ্ঠীবাদী শ্রেণীচরিত্রের পরিচায়ক। কেননা, এর দু'বছর পরে, লাহোর কংগ্রেসে (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ), জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি উত্থাপন করে ও প্রস্তাব গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্তর্জাতিকের মতে, ভারতবর্ষ তখন রয়েছে আদিম স্তরে। বিকাশের এই পর্বে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবির অর্থ হবে, বৈদেশিক শাসনের অবসানহেতু সংস্কৃতির দিক থেকে অনগ্রসরতার দিকে পদক্ষেপ বা বর্বরতার যুগে পশ্চাদপসরণ।[৯১] বোঝা যাচ্ছিল, এই কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিরোধিতার মূলে রয়েছে তাদের শ্রেণীচরিত্রের সুস্পষ্ট ছাপ ও নির্যাতিত দুর্বল দেশগুলির প্রতি তীব্র অবজ্ঞার ভাব। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে অনেকখানি দায়ী, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

যাই হোক, প্রাগুক্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আলোচিত ঔপনিবেশিক প্রশ্নাদির কথা বাদায় রেখে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত (আন্তর্জাতিকের অনুমোদনলাভ ঘটে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) হওয়ার অবকাশে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যাদির সম্মুখীন হয়। সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসীদের নিয়ে যে 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' গঠন করেন তাতে করে কমিউনিস্টদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সংগ্রামোৎসাহ প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' উদযাপনের (১২ অগাস্ট, ১৯৩৯) আবেদন জানিয়ে ৫ অগাস্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ী (সদস্য নন) এক বিবৃতিতে বলেন, 'গত ৯ই জুলাই শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও কংগ্রেসসেবী ও জনসাধারণ সাহসের সহিত সমন্বয় কমিটির আহ্বানে সমবেত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে যে আপোষের মনোভাব

ও ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহার হাত হইতে কংগ্রেসের সংগ্রামশীলতাকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র জাতির মধ্যে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বামপন্থীদের ইহাই সমবেত চেষ্টা।...

'কংগ্রেসের আপোষাত্মক মনোভাব ও দোদুল্যচিত্ততায় বাধাদান করাই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটি সমগ্র জাতির মধ্যে সংগ্রামের বাণী প্রচার করিবে। সমগ্র কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে সংগ্রামনীতি সম্বন্ধে জনপ্রিয় করিয়া তোলাই প্রধান কাজ।'...

অতঃপর জাতীয় সপ্তাহকে সফল করে তোলবার আহ্বান জানানো হয় এবং সমরসজ্জার বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা চালু করার বিরুদ্ধে, জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল সমস্ত শক্তির মিলিত ঐক্যের জন্য আবেদন করা হয়। বলা হয়: 'সংগ্রামের ভিতর দিয়া একতা লাভই আমাদের প্রধান ধ্বনি।'[১২] কমিউনিস্টদের রণকৌশল তথাকথিত বামপন্থীদের সমর্থন ও তাদের জাতীয় সংগ্রামে তীব্ররকম সক্রিয় করে তোলা, ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা সঠিক কৌশল হিসেবে গণ্য। 'সমর সজ্জার বিরুদ্ধে' কথাটির মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের প্রতিফলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের যথাযথ প্রগতিশীল ভূমিকাটিও। কমিউনিস্টদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তীব্র প্রতিবাদ সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কারের ব্যাপারে। অন্যদিকে এই অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল মানবেন্দ্র রায়ের গ্রুপ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট প্রভৃতি দল যারা বামপন্থী সমন্বয় কমিটিতে ছিল। ১৭অগাস্ট, ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টদের তরফে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয় যাতে ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের ওপর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার ভ্রান্তি প্রদর্শন ও কংগ্রেসের ভেতরে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির জন্যে আবেদন জানানো হয়। বলা দরকার যে, কংগ্রেসের ভেতরে ঐক্য ও সংহতির ওপর জোর দেবার সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশের একটা গভীর যোগ রয়েছে। ১৮ অগাস্ট প্রকাশিত এই বিবৃতিটি এইরূপ: 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিয়া জাতীয় ঐক্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত গঠনের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্য জনগণের মধ্যে যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার উপরে আঘাত করা হইয়াছে। একজন কংগ্রেস নেতা-বিশেষকে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা মনে করা চলিবে না। জাতির যে অংশ সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী এবং শক্তিশালী, কংগ্রেসের সেই অংশের উপর ইহা আমলাতন্ত্রের আক্রমণ।'[১৩] এই বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে নেতৃবর্গ শাস্তিদান করতে গিয়ে এমন একটি অংশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন যার ফল হল সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের ভিত্তিমূলকে আরও দুর্বল করে দেওয়া।

সমস্ত বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী, সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের জাতীয় দাবি অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ করবার আহ্বান এতে জানিয়ে বলা হয়---'সমস্ত কংগ্রেসকে সংহতভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।'[১৪] এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন যথাক্রমে পি. সি. যোশী, গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় ঘোষ, আর. ডি. ভরদ্বাজ প্রমুখ। জাতীয় সংগ্রামের ব্যাপারে কমিউনিস্টদের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এরপরেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের সুভাষচন্দ্রের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতঃ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল তখনই, যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের শেষতম চরমপত্রটির কোন সাড়া না পেয়ে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জরুরি বেতার প্রচার মারফৎ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দেয়। ব্রিটিশ-ভারত এই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু গান্ধীর ব্রিটিশ-পক্ষপাত জনসাধারণকে রীতিমত হতাশাকুল করে তোলে। করমচাঁদ গান্ধী এই যুদ্ধে তাঁর সহানুভূতিই শুধু প্রকাশ করেন নি, ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে, পার্লামেন্ট হাউস আর সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের মত ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিধ্বংস হবে, এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছেন, সীতারামাইয়ার ভাষায়: 'In the course of conversation, Gandhi said that he had broken down on the thought of the enemy aeroplanes showering bombs on and throwing into ruins such ancient and historic structures as the Westminister Abbey, the Parliament House and St. Paul's Cathedral. Thet was why he offered his co-operation, which was purely moral co-operation'[১৫]...

যুদ্ধের এই বর্তমান অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা কি হবে সেটা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয় জওহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে, কয়েকটি জরুরি অর্ডিন্যান্স জারী করে, ভারতশাসনসম্পর্কিত আইন পাশ করে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হ্রাস করে---এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, করমচাঁদ গান্ধী অহিংসার পক্ষেই তাঁর বক্তব্য রাখেন যা অধিকাংশ সদস্যেরই মনঃপূত ছিল না। এই অবস্থায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল চেয়েছিল গান্ধীই দেশকে নেতৃত্ব দিন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, 'ওয়ার সাব-কমিটি'র পক্ষে জওহরলাল নেহরু সভাপতির অভিভাষণে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সপক্ষে এক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে আদর্শের কারণে ব্রিটিশ-ভারতীয় জনগণ বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে, সেই আদর্শগত কারণে কেন ব্রিটিশশাসিত একটি জাতির স্বাধীনতার পক্ষে নয়?[১৬] পরবর্তী রামগড় কংগ্রেসের প্রাক্কালে

পাটনায় অনুষ্ঠিত (২৯ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দ) এ. আই. সি. সি -এর বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি 'জাতীয় দাবি' পেশ করে আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের আওয়াজ দেন। ৩মার্চ, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ভেতরকার সমস্ত ভেদবোধ অবলুপ্ত করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা একযোগে একটি সম্মেলন আহ্বান জানান। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। এখানেই গড়ে তোলা হয় একটি অস্থায়ী সংস্থা 'বঙ্গীয় কংগ্রেস ঐক্য ও সংগ্রাম কমিটি' বা 'কমিটি ফর বেঙ্গল কংগ্রেস ইউনিটি এ্যান্ড এ্যাকশন' শিরোনামে। এর আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রণেন সেন। রামগড় কংগ্রেসের আগেই ব্রিটিশ শাসকের দমননীতি প্রবল আকার ধারণ করে। গ্রেপ্তার হন এস. এ. ডাঙ্গে, বি. টি. রণদিভে, মিরাজকর, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ। জয়প্রকাশ নারায়ণও গ্রেপ্তার হন। বাংলাদেশ থেকে গ্রেপ্তার হন মুজফ্‌ফর আহমদ, অজয় ঘোষ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতারা। ১৭মার্চ, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন। এই সম্মেলনের পাশাপাশি চলতে থাকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'নিখিল ভারত আপোষ-বিরোধী সম্মেলন' বা 'অল ইন্ডিয়া এ্যান্টি-কমপ্রোমাইজ কনফারেন্স'। পাটনা-সম্মেলনের তীব্র বিরোধিতা করে সভাপতি তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন যে, জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নে গান্ধীর ভূমিকা হল রীতিমত একজন স্বৈরাচারীর, কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর এই এই স্বৈরাচারিতা জাতীয় সংগ্রামকে দুর্বল করেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ছাড়া তিনি (গান্ধী) যেভাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে শিমলায় গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন ভাষণে তারও কঠোর সমালোচনা করা হয়।[১৭]

রামগড় কংগ্রেস চলার সময়, অর্থাৎ ১৮মার্চ, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দ, অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র অধিবেশন। সভাপতিত্ব করেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। এখানে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তা ছিল সম্পূর্ণত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয় সংগ্রামের অনুকূল, বাস্তবিকপক্ষে 'পাটনা'-প্রস্তাবই (জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবটি ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে) প্রকারান্তরে সমর্থন করে বর্তমান যুদ্ধের সময় প্রগতি লেখকদের ইতিকর্তব্য নির্দেশ করা হয়। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' (২০মার্চ, ১৯৪০) থেকে এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধার করা হল: "The Second Imperialist World War has begun. The peoples of the world are faced not only by brutal horrors of modern warfare by mass destruction, starvation, and disease but also by merciless suppression of their liberties of thought and action by prostitution of knowledge and science by reckless destruction of culture. In India itself war has brought immense and rapid changes in its train. Imperialism in its anxiety to bring all resources of this country to its service has not hesitated to use its dictatorial powers and to muster its old reactionary allies,

landlords and reactionary communalists. It is preparing to meet insistence of the demand by instigating communal discord.

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে লেখকদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সচেতন করে দেন সভাপতি। বলেন,

'It is the duty of Indian writers to expose the imperialist nature of this war and international character of our national struggle. It is our duty to see that our struggle does not degenerate into narrow chauvinism but that on the contrary India joins up more and more with the peoples of other countries in common world struggle for emancipation from imperialism and fascism, defence of civil liberties and freedom of the Press, speech and association, which falls immediately on writers. It is they who have to rally the people against each and every encroachment on these liberties. It is they who have to fight for preservation of cultural values and scientific truth. Above all, it is the duty of Indian writers to throw themselves into anti-imperialist struggle to live up boldly with the people to guide and inspire them to defend them against reactionary and communal detractors. These duties bring out once more (and) more urgently than ever before the need of organising writers and intellectuals.

নরেন্দ্র দেও প্রগতি লেখকদের কাছে আশু দাবির রূপরেখারও একটি ইঙ্গিত দেন, বলেন,

'The immediate demand, we feel, shall be for popular and revolutionary songs for simple folk-dramas for vivid and truthful reportage. It will be our task to fulfil these demands of our people.

সবশেষে তিনি আশাবাদের কথাও শোনান,

'The maintenance of intellectual integrity in the services of the people is and has always been one of the most sacred duties of writers and Indian writers must not fail in this gigantic conflict through

which we, together with the people of other countries, are passing to forge intellectual and cultural weapons that will help to bring ultimate victory for people against imperailism and fascism'.[৯৮]

'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র ভূমিকায় ধনঞ্জয় দাশ জানিয়েছেন যে, চল্লিশের দশকের প্রাক্কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণনীতি 'না এক পাই, না এক ভাই'-এর সূচনাপর্বে পার্টির অসংখ্য কর্মী গ্রেফতার, অন্তরীণ অথবা বহিষ্কৃত হলে পর প্রগতি লেখক সংঘের কার্যক্রম কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়।[৯৯] ব্রিটিশ দমননীতির ফলে এই সময় পার্টি-পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'অগ্রণী'ও বন্ধ হয়ে যায়।[১০০] দমনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে একেবারে শূন্যতার সৃষ্টি হয় নি। রামগড় কংগ্রেস-অধিবেশনের কালে প্রগতি লেখক আন্দোলনের সর্বভারতীয় অধিবেশনই তার প্রমাণ। তাছাড়া বাংলাদেশে মার্কসবাদী চিন্তাচর্চার প্রসারও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষত ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন উদ্যোগে ও আয়োজনে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়টা এদিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখনীয় হয়ে উঠেছিল। এই সময় নিখিল চক্রবর্তী, রেণু রায়, শ্যামনাথ সিংহ, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখের নেতৃত্বে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, যাঁদের অন্যতম হরি কাউল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সেন, সুশীলকান্তি সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, নেভিল ক্যাম্বেল, সমর গুপ্ত, দেবব্রত বসু, নিশীথ রায়, উষা চক্রবর্তী, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, রমা গোস্বামী----এঁদের সহযোগিতায় 'যুব সংস্কৃতি সংস্থা' বা 'ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ধনঞ্জয় বাবু জানিয়েছেন যে ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডাদির সঙ্গে 'ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি উদ্দেশ্যের দিক থেকে মিল থাকলেও ছিল অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও বিপ্রতীপমূলক। 'ওয়াই. সি. আই'(সংক্ষেপে)-এর কাজগুলির অন্যতম ছিল সাংস্কৃতিক আলোচনা-আসর, বিতর্কসভা, অভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী, গান ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রী দাশ মনে করেন 'ওয়াই. সি. আই' ছিল পরবর্তীকালে গণনাট্যের সূতিকাগার'। পার্টির ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বে তখন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়; তাঁর মতে, 'ওয়াই. সি. আই.'-এর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ছিল সমাজের উচ্চকোটি মানুষের সন্তানদের বিলাসী মেয়েলীপনা মাত্র। আসন্ন বিপদের হাত এড়ানোর আর এক কৌশল।[১০১] সে সময় ছাত্র-আন্দোলনগুলি জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনগুলির জাতীয় নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হত। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুব লীগ' ও 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন' সংগঠিত হয়, পরে এগুলি বামপন্থী-চারিত্র্য অর্জন করে। বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব ছাত্র সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নেয়

১৯৩২খ্রীষ্টাব্দে। এঁদের তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থাপিত করা হয়ঃ(১) কমিউনিস্ট ছাত্রদের আলাদা সংগঠন,(২)একটি ছাত্র-আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশ,(৩) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনাগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে তাদের কাছে সমর্থন আদায় ও অর্থসংগ্রহ। এর ফলে গড়ে ওঠে 'কমিউনিস্ট স্টুডেন্টস লীগ'।[১০২] ১৯৩৫-৩৬খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রফ্রন্টের নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই সংগঠনটি নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দের ২৬জুলাই রিক্যুইজিশন সভায় যে নতুন বি. পি.-সি. সি. গঠিত হয় তাতে ছাত্রফ্রন্টের পক্ষে একমাত্র বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ চত্বরেই নয়, বাংলাদেশের ব্যাপক অঞ্চলে ছাত্রদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি অতিদ্রুত বিস্তারলাভ করে।

জনযুদ্ধ পর্ব : প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের বিস্তৃতি

২৩আগস্ট,১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হয় মস্কোতে,অথচ এই চুক্তির সমস্ত শর্ত ভেঙে হের হিটলার ১৮ ডিসেম্বর,১৯৪০-এ রাশিয়া আক্রমণের জন্য 'বারবারোসা' পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন করেন এবং ২২জুন,১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ সংঘটিত হয়।'অপারেশন বারবারোসা' (হিটলারের ২১নং নির্দেশনামা)-রণনীতির লক্ষ্য ছিল ভলগানদী থেকে আর্কেঞ্জেলের দীর্ঘরেখা ধরে এশিয়াটিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন একটি প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলা যাতে সমস্ত ইউরো-রাশিয়া দখল করা সম্ভব হয়।প্রায় দুহাজার মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে জার্মানসৈন্য অবতীর্ণ হলে সারা পৃথিবীতেই তা সাড়া জাগায়। যুদ্ধ শুরুর দীর্ঘ ১২দিন পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ও সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন ৩জুলাই,১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো বেতারে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে জার্মানির বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধকে সোভিয়েত জনগণের সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপান্তরের আহ্বান জানান। বলেন, 'আমাদের দেশ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তার ব্যাপকতা সোভিয়েট জনগণের পূর্ণরূপে অনুধাবন করা দরকার। তাদের আজ ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যুদ্ধপূর্বকালে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে তারা যে সকল শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কার্যে মন নিয়োজিত রাখিয়াছিল, সেগুলি থেকে নিজেকে দূরে সরাইয়া আনিতে হইবে। যুদ্ধ আজ দেশের অবস্থার যে আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাতে এইরূপ মনোভাব সাংঘাতিক ক্ষতিকর। শত্রু দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। যে মৃত্তিকা আমাদের পরিশ্রান্ত দেহের স্বেদে সিক্ত হইয়াছে, আমাদের শ্রমের ফলে যে শস্য ও তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, সে আজ সেগুলি ছিনাইয়া নিতে চায়। সে চায় আমাদের দেশে নূতন করিয়া আবার জমিদারী শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে, জারকে পুনরায় আনিয়া সিংহাসনে বসাইতে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করিতে। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সোভিয়েট

জনগণের পক্ষে এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।...

'ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা কেবল দুইটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও যুদ্ধ নয়, এটা জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশাত্মক যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিস্টদের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।'

এই লক্ষ্যকে আরও অধিক ব্যাপকতা ও তাৎপর্যমন্ডিত করে দিয়ে স্ট্যালিন তাঁর ভাষণে বলেন, 'ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালাইতেছে, মাতৃভূমির মুক্তিসাধনের জন্য আমাদের এই সংগ্রাম উহার সহিত একযোগে পরিচালিত হইবে। মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর এই অভিযানের যারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যারা সমর্থক, তারা সকলে এই দলে সম্মিলিত হইবে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং আমাদের দেশকে সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেন্টের ঘোষণা সম্পূর্ণ তাৎপর্যব্যঞ্জক ও অনুধাবনযোগ্য। এই ঘোষণা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের মনে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক না করিয়া পারে না।'[১০৬]

লক্ষণীয় এই মন্তব্যটি---'মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর এই অভিযানের যারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যারা সমর্থক'——তাদের সবাইকে এই আন্দোলনে সামিল করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। তার কারণ ছিল। পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে ছিল একধরনের মমত্ববোধ, প্রায় প্রতিটি দেশের ঔপনিবেশিক ও পরাধীন জাতির মধ্যে, প্রত্যেক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মনে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও অনেক অ-মার্কসিস্ট মহলেও সোভিয়েতদেশের চরম লাঞ্ছনা গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল।[১০৪] 'নিখিল ভারত কিষাণ সভার' অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক গোপাল হালদার ২১জুন ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে 'যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থা ও কর্তব্য' সম্পর্কে এক প্রকাশ্য আবেদনে কিষাণ ও মজুরদের সোভিয়েতের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। বলেন, ...'সম্প্রতি যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের ফলে ভারতের কিষাণ এবং মজুরগণ নিশ্চয়ই আন্তরিক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ বিনা উস্কানিতে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ কিষাণ ও মজুরদিগের প্রথম ও একমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। ইহার ফলে যুদ্ধের একটা ঐতিহাসিক অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং জগতের সকল দেশের সহিত আমাদের ও ভুখা কিষাণ এবং নিপীড়িতদিগের সুখ দুঃখ গন্ডীর মধ্যে ও ঘটনার গতি যখন যেভাবে উদ্ভূত হইবে

তদনুযায়ী তাহাদের ঐতিহাসিক অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আহ্বান জানাইয়াছে।...

ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক ও কৃষকের এ বিষয়ে গভীর আগ্রহ থাকা অতি স্বাভাবিক। জাতীয় পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কথা আমরা ভুলিতে পারি না। তাহা ছাড়া আমরা সোভিয়েটের নিরাপত্তা কামনা করি।

'আমরা জানি যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র। ইহা সমাজতন্ত্রীদের দেশ। অত্যাচারিত জাতিগুলির উদ্ধারসাধনই ইহার কার্য। কাজেই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় হিসাবে ইহাই হইতেছে শান্তি ও প্রগতির কেন্দ্রস্থল। সোভিয়েটকে রক্ষা করা, কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষে আত্মরক্ষারই তুল্য। ইহাই হইল সমাজতন্ত্রীর নীতি। যাঁহারা সামাজিক প্রগতি এবং বিজ্ঞানে আস্থাবান, তাঁহারা এ কথাই বলিবেন।'[১০৫]

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যও মোটামুটি অনুরূপ। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বিশ্বসাম্রাজ্যের জন্য এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে পদানত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায়রূপে গণ্য করছিল এবং তাদের সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রধান বাধা হিসেবে গণ্য করেছিল। অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স, আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস দেশ ফ্যাসিবাদী শক্তির পদানত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নও আক্রমণের মুখে পতিত হলে কেন তা 'জনযুদ্ধে' পরিণত হবে? শুধুমাত্র শ্রমিক-কৃষকের পিতৃভূমি বলেই কি? সপ্তম কমিন্টার্নে যুক্তফ্রন্ট-কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সোভিয়েতের অবস্থা গুরুত্বের কথা--- '(The further) consolidation of the Land of the Soviets, the rallying of the world proletariat around it, and the mighty growth of the International authority of the Communist Party of the Soviet Union, ... the increasing mass resistance to fascism and the growth of the revolutionary movement in the colonies, ...'[১০৬]

ইত্যাকার বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, কী অপরিসীম গুরুত্বের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখা হয়েছে। এর সঙ্গে ২২জুন, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিন্টার্নের কার্যনির্বাহক কমিটির সেক্রেটারিয়েটের সভার সিদ্ধান্তগুলি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। মূলত এতে আলোচিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানির আক্রমণ প্রসঙ্গ। সেক্রেটারিয়েটের সিদ্ধান্তে কমিন্টার্নের কার্যনির্বাহক কমিটির সংস্থাসমূহের সমগ্র কাজের পুনর্গঠন এবং ডিমিট্রভ, মানুইলস্কি ও তোগলিয়াত্তিকে নিয়ে উক্ত নির্বাহী কমিটির সকল কাজের প্রাত্যহিক তদারকির জন্যে গঠিত হয় একটি গ্রুপ। কমিন্টার্নের উক্ত কার্যনির্বাহক কমিটি জার্মানির আক্রমণের ফলে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নির্দেশ দেয়---'সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ শুধু সমাজতন্ত্রের দেশের বিরুদ্ধেই নয়, পৃথিবীর সকল জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার

বিরুদ্ধেও মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। তাই, সোভিয়েত জনগণের প্রতিরক্ষা নাৎসীদের পদানত জাতিসমূহের প্রতিরক্ষা---ফ্যাসিবাদের দ্বারা বিপন্ন অন্যান্য সকল জাতিরও প্রতিরক্ষা।' উক্ত কমিটির পত্রে আরও বলা হয়, 'নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতাকারী গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি জার্মান ফ্যাসিবাদপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ জাতিকে রক্ষা করার, বাইরে থেকে সোভিয়েত জনগণের ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জোরদার করার, হিটলারভক্ত বুর্জোয়া ব্যক্তিবর্গের মুখোশ খুলে দেওয়ার এবং শান্তিসর্বস্ববাদ ও নিরপেক্ষতাবাদের ছদ্মবেশ নিয়ে যারা জার্মান ফ্যাসিবাদকে সাহায্য করছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। নাৎসীদের সঙ্গে রক্ষা করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি যেসব সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনা নিচ্ছে সেগুলি ব্যর্থ করা অবশ্য কর্তব্য।' জার্মানি ও ইটালির আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, ফ্যাসিবাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ ও জাতি আক্রান্ত তাদের সমর্থনে ও সোভিয়েত জনগণের সমর্থনে আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত করার প্রস্তাবও ওঠে। প্রস্তাবে ফ্যাসিবিরোধী, বিশেষত জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিকে প্ররোচিত করা হয় এইভাবে যে, তারা যেন নিজ নিজ দেশের সরকারের সমস্তরকমের রণপ্রচেষ্টার সমর্থন করে। কেননা সে সমস্ত রণপ্রয়াস তাদের জাতীয়স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত সহায়ক। অবশ্য সেইসঙ্গে এই পরামর্শও দেওয়া হয়েছে যে, এই সব নীতি পালনের সময় নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে সম্পর্কটা হবে স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক।[১০৭]

অর্থাৎ 'জনযুদ্ধ'-এ রূপান্তরকরণের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে এইভাবে বলা যেতে পারে:

১। সোভিয়েত-এর ওপর জার্মান-আক্রমণ সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির তথা মানবজাতির সামনে বৃহত্তম বিপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল

২। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রধান রণাঙ্গন হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলার-বিরোধী তথা ফ্যাসিবিরোধী জোটের মধ্যে অনন্য নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে পড়ে

৩। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সংগ্রাম প্রবলতর প্রভাব ফেলেছিল ফ্যাসিস্ট-অধিকৃত দেশগুলির প্রতিরোধ আন্দোলনের বিকাশের ওপর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই প্রতিরোধ আন্দোলন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ঘটনাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে অন্বিত হয়ে পড়ে

৪। সমগ্র কমিন্টার্নে কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক, বাম, দেশপ্রেমিক তথা যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তির ওপর, সোভিয়েত আক্রমণের পর অতিদ্রুত বোঝা গিয়েছিল এই ঐক্যের আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব, ফলে এর প্রচার-প্রসারের ব্যাপকতা ও বিকাশ ছিল

অবশ্যম্ভাবী এক ঘটনা।

৫। ঘটনার গুরুত্ব আরও একদিক থেকে। জার্মান-সোভিয়েত চুক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণত ক্ষুণ্ণ করেছিল জার্মানি, এই বিশ্বাসঘাতী অপ্রত্যাশিত শক্তি জয়ী হলে বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী বিশেষত ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা হবে বিঘ্নিত। এই আশঙ্কা সোভিয়েতের পাশে এনে তাদের দাঁড় করিয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য সোভিয়েতের এ মুক্তিসংগ্রাম বিশ্বব্যাপী আতঙ্কিত ও আশঙ্কিত জনগণের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ক্রমে ক্রমে সোভিয়েত সেই নিরাপত্তার আস্থা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়।

অতঃপর নাৎসী-জার্মানির সোভিয়েত আক্রমণের তাৎপর্য সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টদের কাছে এই হয়ে দাঁড়ায় যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সর্বাত্মকভাবে আত্ম নিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি হিটলারী-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংহতি, সাহায্য ও সৌহার্দ্য স্থাপন করে, নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষায় ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানায়।

পরাধীন ভারতবর্ষেও কমিউনিস্টরা এই একই প্রক্রিয়ায় আন্দোলন শুরু করে, আক্রমণের অল্পদিন পরেই। তখন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে তার ওপর কমিউনিস্টদের অনেকেই গ্রে-ফতারের ফলে জেলবন্দী নতুবা আত্মগোপন---সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আপোষহীনতার বিরুদ্ধ-প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায়। বাইরের কিছু কর্মী এই সুযোগে পার্টি-নির্দেশিত কাজ-কর্ম নির্বাহ করতেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. জি. বি.)। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে 'দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটেনের জনগণের একটি শক্তিশালী সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে তোলার'[১০৮] আবেদন জানিয়ে। ভারতে কি এই নীতিই অনুসৃত হয়েছিল? অর্থাৎ, ব্রিটিশ-ভারতে সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আন্দোলন না করা?

বাস্তবিকপক্ষে, কমিন্টার্নের গৃহীত নীতিগুলির পক্ষেই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখাসংগঠনসমূহ প্রচার চালিয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই এই সিদ্ধান্ত।

২০ জুলাই, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিক, শিল্পী, আইনজীবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী একটি আবেদন-বিবৃতি প্রচার করেন। এতে বলা হয়ঃ 'সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে, ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকট-কালে আমরা মনে করি, নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের

মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েট শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি, কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার শাসনের কুশাসনের যে কুৎসিত উত্তরাধিকার সোভিয়েট ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহা যখন স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েটের বর্তমান কীর্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক জগতের দুইজন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ্---সিডনি ও বিয়েট্রিস্ ওয়েব---তাঁহাদের 'সোভিয়েট কমিউনিজম---এক নূতন সভ্যতা' (Soviet Communism — A New Civilization) নামক পুস্তক প্রকাশ করার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য তথ্য সকলের গোচরে আসিয়াছে।'

এই আবেদনে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রকৃত প্রস্তাবে কীভাবে তার সম্পদ সমবণ্টনের ভিত্তিতে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, শিক্ষার বিস্তার, নারী ও শিশুর কল্যাণের জন্যে অথবা বেকারত্ব দূরীকরণে কী ভূমিকা নিয়েছে সবিস্তারে তার বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সাম্যবাদী সোভিয়েত জাতিসমস্যা ও ভাষাসমস্যার সমাধান করেছে, শ্রমশিল্পে ও কৃষিতে অগ্রসর হয়েছে তাও বলা হয়েছে। পরিশেষে উক্ত আবেদনে পরাধীন ভারতের পক্ষ থেকে সোভিয়েতের শুভকামনা করা হয়েছে: 'কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন, তথাপি সোভিয়েটে অন্ততঃ আমাদের শুভকামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দিন তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।'[১০৭]

এই আবেদনে তৎকালীন বহু সংখ্যক বিখ্যাত সাহিত্যিক, অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক প্রমুখের স্বাক্ষর রয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাড়াও আর যারা স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা হলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, হিরণ সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু, অরুণ সেন, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, এ. আর. মলিহাবাদী, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, কালিদাস নাগ, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেণু রায়, নিখিল চক্রবর্তী, সরসীকুমার সরস্বতী, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ।

২১জুলাই,১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউনহলে 'সোভিয়েট দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ বুদ্ধিজীবিদের একটি সমাবেশ হয় এবং এখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' বা 'ফ্রেন্ডস অব দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন' বা সংক্ষেপে এফ. এস. ইউ। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সমিতির সাংগঠনিক কমিটিতে ছিলেন মৌলভি সৈয়দ নৌশের আলি, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দত্তগুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জ্যোতি বসু, কমলা দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেলা ক্রামরিশ, বিনয় ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চিরঞ্জীলাল ত্রুক, বীণা দাস, এ. আর. মলিহাবাদী, এন. দত্তমজুমদার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, আবদুর রেজ্জাক, মণিকুন্তলা সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত(চেয়ারম্যান), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার(কোষাধ্যক্ষ), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য(যুগ্ম সম্পাদক), মনোরঞ্জন রায়, হীরেন ধর, সুনীল সেন(সহ সম্পাদক)।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, এফ. এস. ইউ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বরুণী গোস্বামীর একটি প্রতিবেদনে[১১০] কয়েকটি তথ্যবিভ্রান্তি ঘটেছে। যেমন, তিনি লিখেছেন, 'ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সমিতি গঠনের সময় সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ভূপেন্দ্রনাথ উক্ত সংঘের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। দ্বিতীয়ত সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন প্রচারের কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, সমিতি গঠনের আগেই আবেদনটি প্রচারিত হয়। তৃতীয়ত, দুটি নাম— চিন্মোহন সেহানবীশ ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এঁদের নাম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত আবেদনে মুদ্রিত হয় নি।[১১১] যাই হোক, এই সমিতির উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'দ্য ল্যান্ড অব দ্য সোভিয়েটস'[১১২] নামক একটি সংকলন প্রকাশ, 'সোভিয়েট সিরিজে' কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি। বলা অবান্তর নয় যে, রামগড় কংগ্রেসের পর প্রগতি সাহিত্য যখন বিশ্বযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায়, রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর উত্তাপে ও উন্মাদনায় দেশের আবহাওয়া সংস্কৃতির চর্চায় খানিকটা প্রতিকূল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের অনেকেই যুদ্ধ-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। জাতীয় কংগ্রেসে-ও তারই উত্তাপ ছিল। যুদ্ধ-বিতর্কে কংগ্রেস, গান্ধী ও বামপন্থীরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পড়ে। সোভিয়েত আক্রমণের পর সমিতি র মাধ্যমে প্রগতি-সংস্কৃতি চর্চা অনুকূল একটা বেগ লাভ করে। সোভিয়েতের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন জনসভা, পোস্টার প্রদর্শনী, সংগীত আসর করে কলকাতার জনজীবন অনেকটাই মাতিয়ে তোলে। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে এই উন্মাদনা আরও সাংগঠনিক সংহতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে।[১১৩]

প্রগতি লেখক আন্দোলনের ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা: ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ

১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। তার আগে উল্লেখ করা দরকার, সোভিয়েতভূমি আক্রমণের পর আমাদের দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা জোয়ার বয়ে যায়। সোভিয়েতদেশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও ঘটনা জনমানসে প্রভূত আবেগ সঞ্চার করে। বিভিন্ন জায়গায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সম্মেলনাদি হতে থাকে। এরকম একটি সম্মেলন ১১ ডিসেম্বর, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত হয়। 'সুরমা উপত্যকা ও শিলং সোভিয়েট-সুহৃদ সমিতির প্রথম সম্মেলনের' সভাপতির অভিভাষণে গোপাল হালদার বলেন, ...'এই যুদ্ধটা শুধু জার্মানি-রুশিয়ার যুদ্ধ নয়,---এ যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপীয় ফ্যাসিজমের সঙ্গে সোভিয়েটের, পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সঙ্গে পৃথিবীর নবজাত বিপ্লবী-শক্তির। এই কারণেই শুধু সোভিয়েট রণাঙ্গনে হিটলারের দুই একটি পরাজয় ঘটলেই যে সোভিয়েট জয়ী হ'ল, এমন কথা বলা চলবে না। যুদ্ধ আজ পৃথিবী-জোড়া, পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া-শক্তিরা পরাজয়ের সাহায্যে আসবেই। তাই হিটলারের পরাজয় আরম্ভ হ'লে সোভিয়েটকে এশিয়ার দিক থেকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হবে জাপান।' কেন জাপান সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালাবে সেই ব্যাপারটি হালদার মহাশয় দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন এবং পরিশেষে উপসংহারে সতর্ক আশাবাদের সঙ্গে বলেন, ...'সোভিয়েট যুদ্ধ শেষ হয় নি, তার প্রথম পর্ব মাত্র শেষ হ'ল, আরম্ভ হ'ল জার্মান ফ্যাসিস্টদের প্রথম পরাজয়ের পর্ব। এই যুদ্ধ শেষ হবে পৃথিবী-ব্যাপী ফ্যাসিস্টদের চরম পরাজয়ে---আর তা সম্পূর্ণ হবে তেমনই পৃথিবী-ব্যাপী গণশক্তির উদ্বোধনে, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসে।'[১১৪] শেষ বাক্যটি মার্কসবাদী বিশ্লেষণের চূড়ান্ততা প্রকাশ করে, কারণ, ভবিষ্যতের সাক্ষ্য এরই অনুকূল।

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনসংঘে'র কথা। এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। এই জনসংঘ দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকার অন্যতম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'চায়না ফাইটস', 'স্বাধীনতার শত্রু জাপান', মনোরঞ্জন রায়ের 'দেশরক্ষী বাহিনী', স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের 'আজকের কর্তব্য' ইত্যাদি। এইসব পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সোভিয়েতের সাহায্যার্থে ও ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচারকার্যে ব্যয়িত হয়। খুব সম্ভব, এই জনসংঘের কার্যারম্ভ ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কোন এক সময় শুরু হয়।[১১৫]

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এশিয়ায় জাপানি আগ্রাসন তীব্র হয়ে ওঠে। সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলে এই যুদ্ধকে অভিহিত করা হয় 'জনযুদ্ধে'র যুগ নামে। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট বন্দীদের ওপর থেকে ব্রিটিশ শাসকের নিষেধাজ্ঞা ওঠে, রণকৌশলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে এর অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর কমিন্টার্নের নির্দেশ

ছিল নিজ নিজ দেশের শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করায়, অবশ্য কমিউনিস্টদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উপদেশও ছিল। এই সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে, সেই সঙ্গে গ্রহণ করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী। 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত নির্দেশনামাটি 'বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতবর্ষ' এই শিরোনামে:

'গত ২৫মে যে লন্ডনে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ভারত সম্পর্কে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। (১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহযোগে ভারতের জনগণ যাহাতে আত্মরক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সহিত অবিলম্বে মিটমাটের আলোচনা শুরু করিয়া দাও, (২) সমস্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তি (মুক্ত) কর, ভারতীয় শিল্পের উপর সর্বপ্রকার বাধাবন্ধক তুলিয়া লও ও সকল রকমে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় জনগণকে সংগঠিত হইতে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য কর।'[১১৬]

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে এইসব নির্দেশাবলী যাবং ও গৃহীত হয়েছে ভারতে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যও দাবি করেছে। কিন্তু এর আগে, রামগড় কংগ্রেস চলাকালীন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে 'আপোষ- বিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল, এই নির্দেশের ফলে তা প্রতিষেধিত ব্যাহত হয়। এর সম্পূর্ণ প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করার আগে সমকালীন আরও কয়েকটি ঘটনা যতান্ত জরুরি যা প্রগতি আন্দোলনকে এক প্রগাঢ় বিস্কৃতি দিয়েছিল ও ভিন্নতা সঞ্চার করে এর গতি বেগ বৃদ্ধি করেছিল।

পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের 'প্রাণকেন্দ্র' ছিল ঢাকা। এই ঢাকা শহরেই প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হন প্রতিশ্রুতিবান গল্পলেখক সোমেন চন্দ 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' থেকে ঢাকায় ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন করতে গিয়ে। সেদিনের তারিখটি ছিল ৮মার্চ, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর কথা উদ্ধার করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন: '... এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পন্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মন্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এইখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্ত কর্মী ও শিল্পী জীবনের।'[১১৭]

করুণ এবং মর্মস্পর্শী এই স্মৃতিচিত্র। ফ্যাসিবিরোধী এই আন্দোলন সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর এক নতুন মাত্রা লাভ করে। বাংলাদেশে শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই জঘন্য ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। সংবাদপত্রে লেখক-শিল্পীরা এই মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। 'পরিচয়ে' একটি আবেদন প্রকাশিত হয়, এখানে তা উদ্ধার করা হলঃ

'লেখক ও শিল্পীদের প্রতি নিবেদন----

ভারতবর্ষ আজ অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন। আমাদের গৃহ, পরিজন, জীবিকা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় জাপানের আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছে। আমরা এতদিন যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে মুক্তির জন্য অপরিমেয় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই মুক্তি যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ঠিক সেই সময় ফ্যাসিস্টরা কঠিনতর শৃঙ্খলে আমাদের বাঁধিবার জন্য উদ্যত, জাপানী আক্রমণকে যদি আমরা প্রতিরোধ করিতে না পারি তবে এদেশে নূতন করিয়া এমন এক বিদেশী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা আমাদের এতদিনকার সংগ্রামার্জিত কোন অধিকারই লেশমাত্র টিকিয়া থাকিতে দিবে না---আমাদের কংগ্রেস, আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য বিবিধ অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

এই চরম সঙ্কটকালে সাহিত্যিক-সমাজ দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবিগণ অপেক্ষা সমাজে সাহিত্যিকদের মর্যাদা ও প্রভাব অনেক বেশী। এই মর্যাদা ও প্রভাবের উপযুক্ত মূল্য দিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ বিপন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার দৃঢ়-সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করিবার, বিভ্রান্ত জনসাধারণের চিন্তাকে আত্মসমর্পণ ও আত্মঘাতের পথ হইতে ফিরাইয়া সক্রিয়তার পথে চালিত করিবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের। ......ফ্যাসিস্টরা জানে যে, দেশের স্বাধীন চিন্তানায়ক ও মনীষীরা তাহাদের দুর্গসিদ্ধির বড় বিঘ্ন---তাই আজ রোমাঁ রোলাঁ বন্দী, টলস্টয়ের স্মৃতি অপমানিত, প্রবাসে নির্বাসনে রুগ্ন ফ্রয়েডের জীবনাবসান, আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখ মহাত্মাগণ স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর মন্ত্রশিষ্য জাপানে এবং জাপান অধিকৃত দেশে অসংখ্য লেখক ও শিল্পী নিহত ও নির্যাতিত। জার্মানীতে ইউরোপের আর সাহিত্যসৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব এবং চীনের বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী বোমার অগ্নিকাণ্ড---সংস্কৃতির ধ্বংসের একই অভিযান। এই ধ্বংসবন্যার প্রতিরোধ করিবার জন্য সাহিত্যকে আজ তাহার সাহিত্য ও সর্বস্ব পণ করিতে হইবে এবং এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া নূতন জগতের নূতন সাহিত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষার এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া "ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" গঠিত হইয়াছে।'...[১১৮]

এই সংঘ গঠিত হয় ২৮মার্চ, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে। বলাই বাহুল্য, সোমেন চন্দের মৃত্যুজনিত বেদনা শিল্পী-

সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল করে। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে এই সংবাদ খুব অল্প পরিসরে প্রতিবেদিত হয়। বলা হয়: 'The other day there was a public meeting of anti-Fascist authors and journalists at the Calcutta University Institute, presided over by Sjt. Ramananda Chatterjee. Besides the president, Sjt Atul Chandra Gupta (Advocate), Dr. Amiya Chakravarti, and many others addressed the meeting. Anti-Fascist cartoons were exhibited in the hall. There is a surging anti-Fascist feeling in the country, which, however, is mostly running to waste.'[১১৯]

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর লাইব্রেরী হলে খ্যাতনামা সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'। সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই শত্রুকে রুখবার জন্য সাহিত্যিকদের ও শিল্পীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানান। এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের অন্যতম হলেন প্রমথ চৌধুরী, যামিনী রায়, অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সৈয়দ আইয়ুব, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আব্দুল কাদের, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ মুখার্জী, সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এই সংঘের সাংগঠনিক সমিতির সভাপতি অতুল গুপ্ত, সাংগঠনিক সমিতির সদস্য গোপাল হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক।[১২০] বিষ্ণু দে'র '২২শে জুন' বইটির পরিশিষ্টে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র কার্যকরী সমিতির সদস্যদের তালিকা এই প্রকার: শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়--সভাপতি, যামিনী রায়--সহ সভাপতি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (পদের অনুক্রমে নয়), অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী--অর্থাধ্যক্ষ, বুদ্ধদেব বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, টেনা সেনগুপ্ত, হিরণকুমার সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, আব্দুল কাদির, বিনয় ঘোষ, মহীউদ্দিন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ---সভ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে---সম্পাদক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলনে স্থির হয়, 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এরপর 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র শাখারূপে বাংলাদেশে কাজ করবে। সম্প্রতি একটি অসমর্থিত তথ্যে বলা হয়েছে যে 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এ 'শিল্পী' কথাটি সে সময় যুক্ত ছিল না।[১২১] লক্ষণীয়, এই সংঘ সোমেন চন্দের স্মৃতির প্রতি 'প্রাচীর' (কবিতা ও গানের সংকলন) শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এরপরেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে শুরু হয়ে যায় ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক প্রচারাভিযান। কয়েক মাসের মধ্যে এর অগ্রগতি শক্ত হয়ে ওঠে। মে মাসের একটি রিপোর্ট এইরকম: ১১মে, ১৯৪২——রংপুর, ৯মে, ১৯৪২——ফরিদপুর, ৭মে, ১৯৪২——নবদ্বীপ, ৯মে, ১৯৪২——কিশোরগঞ্জ, ১৩, ১৪, ১৫মে, ১৯৪২——জামালপুর, ১৪মে, ১৯৪২——বজবজ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও হবিগঞ্জ ও চব্বিশ পরগণায় একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী ও জনরক্ষা ফৌজ গঠনের ওপর জোর দিয়ে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।[১২২] এই পর্বে বিভিন্নভাবে চাষী, মজুর ও জনগণকে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াবার জন্যেও আহ্বান জানানো হতে থাকে, জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যেও অনুরোধ করা হতে থাকে।[১২৩]

অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ পরিস্থিতির মূল্যায়নে ও স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দেওয়া প্রস্তাবের বিরোধিতায় গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। এলাহাবাদ এ. আই. সি. সি.-এর অধিবেশনে (২৯এপ্রিল-২মে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'নন্‌ভায়োলেন্ট নন্‌-কোঅপারেশন'-এর আহ্বান জানিয়ে ভারতীয় জনগণকে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে তৈরি থাকার পরামর্শ দেয়।[১২৪]

পাশাপাশি ছাত্রসম্মেলনাদিও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ছাত্রদের ভূমিকা ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল সে সময়। ১৫মে, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম অধিবেশন বসে ছাত্র সম্মেলনের। ১৮মে, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ, এদিনের সমাপ্তি অধিবেশনটা ছিল পুরোপুরি সংস্কৃতি-অনুষ্ঠান। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে জাতীয় প্রতিরোধের গান সমবেত কন্ঠে গাওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ইতিমধ্যে জনপ্রিয় সংগীতটি---'বজ্রকন্ঠে তোলো আওয়াজ' প্রতিযোগিতার বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা(ছাত্রকর্মী) গণনাট্য অভিনয় করেন, চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল।[১২৫] বলাই বাহুল্য, অনুষ্ঠানটি পার্টির কর্মসূচীরই একটি অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সমাবেশে জাপানের আক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, কেন করতে হবে এরকম বক্তব্যের ওপর বেশ জোর দেওয়া হতে থাকে। প্রতিরোধ-কৌশলের এই নীতি মূলত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশসম্মত ছিল, আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে।[১২৬]

এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার সুবাদে ২২জুন, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে 'সোভিয়েট দিবস' পালনের আহ্বান জানান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। 'কমরেডদের প্রতি' শীর্ষক এক আদেশে বলা হয়:

'২২শে জুনের বক্তৃতার মধ্যে প্রতি সভায় বা প্রতি জনসমাবেশে নিম্নলিখিত ধরনের প্রস্তাব পাশ করুন:--

এই সভা সোভিয়েট রাশিয়ার বীর লালফৌজ ও বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

স্বাধীনতার জন্য ফ্যাসিস্ট দস্যুদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়া যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, এই সভা তার পরিপূর্ণ জয় কামনা করে।

এই সভার মতে মিত্রশক্তিবর্গের উচিত অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে ১৯৪২ সালেই যাতে

ফ্যাসিস্টশক্তির পরাজয় হয় তার ব্যবস্থা করা। এই সত্য বিশ্বাস করে আমাদের ভারতবর্ষে জাপানী দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেই আমরা সোভিয়েটকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারি।'[১২৭]

গোটা ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ জুড়েই কমিউনিস্টরা জাপান আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। বিহারের বিহটা গ্রামে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলনে পূরণচাঁদ যোশী বলেন, 'আমাদের এই মহা জাতির প্রত্যেকটি সন্তানের পবিত্র কর্তব্য জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করিতেছি।'[১২৮] ইতিমধ্যে সম্ভবত কমিউনিস্টদের জাপান-বিরোধিতা ও মিত্রশক্তিকে সাহায্যকারীর ভূমিকায় দেখে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তি দিতে আরম্ভ করে। তবে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা তোলা হয় না। কয়েকজন কমিউনিস্ট রাজবন্দী মুক্তি পেয়ে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম হলেন কমরেড আবদুল হালিম, ধরণী গোস্বামী, রণেন সেন, মহম্মদ ইসমাইল, গোপেন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন, গোপাল আচার্য, প্রমোদ দাশগুপ্ত, আবদুল মোমিন, সুশীল ব্যানার্জি, শৈলেন মুখার্জি, ও নৃপেন্দ্র মুখার্জি--এই বার জন। তাঁরা বলেন,

...'আমরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে সম্মিলিত জাতিগুলির যুদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ। ভারতের জনগণ আপন শক্তিতে এই যুদ্ধে যোগ দিয়া ও ইহাতে জয়লাভ করিয়াই নিজেদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে একমত যে, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট নহিলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সফল জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু এই গবর্ণমেন্ট বিদেশী বলিয়া ও জাতীয় গবর্ণমেন্ট নয় বলিয়া ইহার বর্তমান যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত নয়---কংগ্রেস নেতৃত্বের এই কথা আমরা স্বীকার করি না।'[১২৯] বলা দরকার যে, এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী এই বক্তব্য। কমিউনিস্টদের কার্যক্রম তাই এই পর্বে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও এই সময়কার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'পীপলস ওয়ার', ১৫ নভেম্বর, ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, যে মাসে প্রগতি লেখকদের একটি সম্মেলন আহুত হয়ে থাকবে। শ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গত যে মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই ত্রুটি সংশোধনের ('সঠিক সাংগঠনিক ভিত্তির অভাব'---উল্লেখ শ্রী মুখোপাধ্যায়ের) চেষ্টা হয়'----সম্ভবত ছাত্র-সমাবেশের সময় এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। তিনি উক্ত প্রতিবেদনে 'হামদম' পত্রিকার সম্পাদক এস. এস. চৌহানের ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের খবরও

জানিয়েছেন। তাঁরই ওপরে ছিল আন্দোলন পুনর্গঠনের ভার।[১৬০]

খুব সম্ভব, 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগে ২৪ জুন, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রধান সম্মেলন হয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল চিত্রপ্রদর্শনী। সোভিয়েত সম্পর্কে ছিল অনেক ছবি, আর ছিল স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধের সময়কার কয়েকটা পোস্টার। এই সভায় ট্রাম ওয়ে ইউনিয়নের ও কর্পোরেশন ইউনিয়নের শ্রমিক মিছিল এসে যোগ দিয়েছিল। সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন যে, মন্ত্রী হিসেবে তিনি খুবই চেষ্টা করছেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র কাজ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সোভিয়েতকে অভিবাদন জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রস্তাব সমর্থন করেন ট্রামওয়ে শ্রমিকদের নেতা সদ্য কারামুক্ত মহম্মদ ইসমাইল। উল্লেখযোগ্য হল ছাত্রফেডারেশন(বাংলাদেশ)-এর কর্মী ও সম্পাদক শঙ্কর রায়চৌধুরীর ভাষণ। এই সভায় গাওয়া হয় 'সোভিয়েট ভূমি বিপ্লবিক প্রিয়' গানটি। অন্যান্য গানের মধ্যে 'জাগরে মজদুর, জাগরে কিষাণ' (বিনয় রায়), ছাত্রকবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' গানটি, 'বঢ়্ চলো, কিষাণ বীর, বঢ়্ চলো মজুর বীর' (বিনয় রায় কর্তৃক গীত) গানটিও গাওয়া হয়। শেষ বক্তৃতা দেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। শেষ গান 'ইন্টারন্যাশনাল' গাওয়া হয় সভার শেষে।[১৬১]

কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ে গড়ে তোলা হয় তীব্র আন্দোলন। এই তীব্রতা সঞ্চারের জন্যে 'জনযুদ্ধে'র সম্পাদক লেখেন, 'দেশবাসীর মধ্যে মুক্তি আন্দোলনকে এত ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে একজনও ফ্যাসিবাদবিরোধী যেন কারাগারে না থাকে এবং বাহিরে ফ্যাসিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের উপর একটীও নিষেধাজ্ঞা না থাকে।'[১৬২] ১৬জুলাই, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ, এন. এম. যোশীর আবেদনমত সারা দেশব্যাপী শোভাযাত্রা-মিছিল-এর আহ্বান জানানো হয় বন্দীদের মুক্তি দাবি করে।

৭জুলাই, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে পালিত হয় 'জাপবিরোধী ঐক্য দিবস'। এই দিন তোলা হয় বিখ্যাত স্লোগান 'জাপানকে রোখা চাই', 'চীন-ভারত ভাই ভাই'। সভা বসে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' রবীন্দ্রসংগীতটি দিয়ে সভার শুরু হয়। ছাত্রকর্মী প্রশান্ত সান্যালের ভাষণের পর তাঃ খাও ইংরেজিতে ও মিঃ সেং চৈনিক ভাষায় বক্তৃতা দেন। সভাপতির অভিভাষণে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী বলেন, 'চীন যে জাপানের বিরুদ্ধে এইরকম শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে, তার কারণ সেখানে প্রত্যেকটা লোক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। ভারতবর্ষে জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলবার জন্য দরকার জাতীয় সরকার। আর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই জাপবিরোধী ফ্রন্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে।' এই ঐক্য বলতে স্পষ্টত বোঝানো হয়েছে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের কথা। এরপর বিনয় রায়ের গান, 'রবীন্দ্রনাথ নোগুচির কথোপকথনের নতুন প্রোগ্রাম, 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটিকার অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

ঘোষণা করা হয়।[১৬৩] ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এ অবস্থায় পার্টির কাজকর্ম প্রকাশ্য পথে চলতে শুরু করে। সৃজনশীল কাজকর্মের মধ্যেও এই তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'লেখক ও শিল্পীদের প্রতি' এক আবেদনে প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রার্থনা করে বলেন,'ফাসিস্ট আক্রমণের মুখে বিপন্ন স্বদেশের রক্ষাকার্যে যে সকল বাঙালী লেখক ও শিল্পী তাঁহাদের সৃজনশক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আমরা তাঁহাদের পরিপূর্ণ-সহযোগিতা কামনা করিতেছি। তাঁহারা যেন ফাসিস্ট-বিরোধী গল্প, কবিতা, গান, নাটিকা, প্রবন্ধ, ছবি, কার্টুন প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া সংগঠনের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকা, সাহিত্য-সংঘ প্রভৃতিকেও আমরা সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছি। প্রেরিত রচনাদি মনোনয়ন ও প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করিতেছি।'[১৬৪] এই আবেদনটি ঘোষিত হয় ৩আগস্ট, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে।

এরই দু'দিন পরে, ৭ ও ৮ আগস্ট, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 'ভারত ছাড়ো' বা 'আগস্ট বিপ্লব' নামে খ্যাত এই আন্দোলন সারা ভারতে এক স্বতঃস্ফূর্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সূচনা করে। এই আন্দোলন গণরোষ ও গণবিক্ষোভের আকারে বিস্ফোরিত হলে পর কমিউনিস্টরা এই সময় প্রায় একঘরে পরিণত হয়। যুদ্ধের নীতিগত কারণে জাতীয় দাবিকে অগ্রাধিকার না দেওয়ায় কমিউনিস্টদের প্রতি যে কুৎসা রটনা করা হয় তা ছিল উদ্দেশ্যমূলক, সর্বতোভাবে সংকীর্ণ দলীয় মতান্ধতাই এর অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। কমিউনিস্টরা যে স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করেন, মানেন, ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী হ্যারি পলিটকে উদ্দেশ্য করে লেখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পূরনচাঁদ যোশীর একটি চিঠিই তার বড় প্রমাণ। তিনি বলেন:

'বর্ষা, বাসয় সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের ফলে আমাদের স্বদেশপ্রেমিকেরা আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ করিতে প্ররোচিত হইতেছেন। আপনাদের কর্তব্য আপনাদের গভর্ণমেন্টকে চাপ দেওয়া যাহাতে গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সাথে আলোচনা চালায়। ভিত্তি হইবে, ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া নেওয়া এবং সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা।'[১৬৫]

এই আত্মঘাতী প্রবণতা বলতে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট বিরোধিতার কথাই নয়, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে রাজনৈতিক-বিচ্ছিন্নতার বীজ উপ্ত ও উদ্গত হয়েছে তাও বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে 'জনযুদ্ধে'র সম্পাদকীয়[১৬৬] 'জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য' শিরোনামায় বলা হয়েছিল, 'আজ সর্বপ্রথম চাই, দেশের দুইটী জনপ্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য। এই ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের শিরদাঁড়া।' এই স্পষ্ট ঘোষণা

নিখিত-কৌশলই ছিল না, তার প্রয়োগও কমিউনিস্টদের রণকৌশলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ফলে বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল বিভিন্ন সৃজনশীলকর্মে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগ ও তৎপরতা। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র তরফে ৪অক্টোবর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে এক আহুত সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণ। স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে উক্ত সংঘের সম্পাদকদ্বয় বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমবেত সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বলেন, 'ফ্যাসিজম শুধু রণচক্রীর এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সর্বভেদেশে দল নয় বা সাম্রাজ্যবণ্টনেই তার শেষ নয়। সেটা একটা নষ্টামির মনোভাব। যার উৎস জীবনকে ঘৃণা, অবজ্ঞা---যার বৃদ্ধি অবিশ্রাম উত্তেজনায়, হিংসায় ও রক্তপাতে। তাই শিল্প ও সাহিত্য স্বভাবতই মর্মিত সেখানে হাঁপিয়ে মরে।' এই সভায় অনেক মুসলমান সাহিত্যিক এসেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে সর্বজনমান্য প্রবীণ সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটকে এড়াইয়া গেলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের কোন সার্থকতা থাকে না। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখকদের ও শিল্পীদের উচিত জনসাধারণকে যথার্থ বিপদের বিষয়ে সজাগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সঙ্কটের জন্য কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া। হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার জনিত অনৈক্য বোধ আছে তাহার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করা।' অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব বসু ও তারাভূষণ বসুরায় দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সুজাতা মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ অভিযানে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তৃতা দেন আবু রুশদ ও আয়ুবনুল হক খাঁ। সভাপতির অভিভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, 'মানব স্বাধীনতার উপাসকমাত্রেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী। যাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক, তাঁরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী হইতে বাধ্য। কাজ সুর্গতির দিন বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ আদর্শ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা লইয়া যদি সাহিত্যিকরা ঐক্য সাধনে অগ্রসর হন তবেই তাহাদের সৃষ্টি সার্থক হইবে।' এঁদের বক্তৃতার সুর ছিল জাতীয় ঐক্যের এবং এই ঐক্যই জাতীয় মুক্তি আনবে, এই বিশ্বাসের। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শম্ভু সাহা, মন্মথ সান্যাল, আবদুল কাদের, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, শান্তি দেবী, অরুণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুর্ণকমল ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ।[১৬৭] হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত উদ্যোগ রণকৌশলের দিক থেকে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে এরপরেই ১নভেম্বর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'সারা বাংলা একতা সপ্তাহ' শুরু করবার আহ্বান আসে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি উত্তরোত্তর অভিযোগ ও কুৎসা রটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশী বলেন, 'বর্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি মানুষের

সঙ্গেই দাঁড়াইয়াছে। দেশব্যাপী কংগ্রেস আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসাই রটাইয়াছে: আমরা গভর্ণমেন্টের দলে ভিড়িয়াছি, সরকারের টাকা খাইতেছি ইত্যাদি। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠনের জন্য আমরা আন্দোলন করিতেছি। আমরা মনে করি, ইহাই আমাদের প্রকৃত স্বদেশী কর্তব্য। কুৎসার বদলে আমরা কুৎসা রটাই নাই। আমাদেরই একজন দেশপ্রেমিক হিসাবেই আমরা সবাইকে ধৈর্য্যের সাথে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।'[১৩৮]

এই বক্তব্যই আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে ছিল ১৯-২০ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠানে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও বিপুল জনসমাবেশের মাঝে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। মূল সভাপতির অভিভাষণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভারতের জনসাধারণ তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষিবর্গ কেউই চায় না ফাসিবাদী জার্মানি, জাপান অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি ভারতে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ...ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না, এবং চাইবে না। ...একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে: আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব, হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক। . .....

ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে- -এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম।'[১৩৯]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মিঃ হবিবুল্লা বাহার, মিঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়---এই পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন উদ্বোধন করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। হিরণকুমার সান্যাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, যামিনী রায়, সাজ্জাদ জহীর, 'এশিয়া' পত্রিকার ভারতীয় সম্পাদিকা সাবুইত্, এমারুসন সেন, তেলেগু কবি ও নাট্যকার অধ্যাপক আব্বুরি রামাকৃষ্ণ রাও, যুক্তপ্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ও বেনারসের 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদক মন্নালাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেন। ঢাকা, নদীয়া, ময়মনসিংহ, বহরমপুর, বাঁকুড়া, খুলনা প্রভৃতি জেলা থেকে, অন্যদিকে বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ থেকেও প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করতে আসেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধি

মুসলিম লেখক সংঘ[১৪০] ও অন্যান্য লেখক-শিল্পী সংঘ, কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে সম্মেলনে অভিনন্দন জানানো হয়। এই উপলক্ষে পঞ্চান্ন জন কবির কবিতার সংকলন 'একসূত্রে' প্রকাশ করেন সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম ও জঘন্যরূপ---ফ্যাসিজমকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ করবার জন্যে। এছাড়া 'হংস'(হানুস) পত্রিকার এস. এম. চৌহানের গ্রেফতার, সংঘের অন্যতম সদস্য বিনয় ঘোষের ওপর চট্টগ্রামে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা, 'যুগান্তর', 'স্টার অব ইন্ডিয়া', 'আজাদ' ইত্যাদি পত্রিকার মুদ্রণের স্থগিতাদেশ ও সরকারী ব্যবহারে শতকরা নব্বইভাগ কাগজ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা মিঃ হবিবুল্লা বাহার বলেন, 'চট্টগ্রাম ও আসামে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও আটলান্টিক মহাসাগরে যেসব বাঙালী খালাসিদের হাত হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে গিয়া বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আমাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই' বলে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে 'নূতন করিয়া বাঙলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে'। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ও কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন, 'রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্গত এই মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং পদদলিত হয় তখন মনুষ্যত্বের উত্তর সাধক যাঁরা সেই শিল্পী ও সাহিত্যসেবকগণ কোন যুক্তিতে আপন আপন গৃহকোণে উদাসীন ভদ্রলোকের মতো দিন যাপন করিবেন?'[১৪১] সম্মেলনে সহযোগী সভাপতির অভিভাষণ দেন বুদ্ধদেব বসু, বলেন, '...যখন দেখলুম আধুনিক জার্মানির দুই মহামানব---আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড---তাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন চৌর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওলা ঘেরাও হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, যখন দেখলুম জার্মানির সব বড়ো বড়ো লেখক শিল্পী, সাংগীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী, যখন কানে এলো ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের সতীত্বহরণের ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলা-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে চিন্তায় রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হ'লো, তখন বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড়োরকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তার প্রমাণের জন্যও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হ'লো না, আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ। এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো, বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে, বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশি জাতির উপরেই অত্যাচার চলে তা নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়, শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিজেদের 'উন্নতি' সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ ধারেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত'।'[১৪২]

হিরণকুমার সান্যাল ১১ডিসেম্বর,১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে,অর্থাৎ সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যিক-শিল্পীর শ্রেণী নির্ণয়ের প্রয়াস পান এবং বর্তমান পটভূমিতে শিল্পী-সাহিত্যিকের সার্বজনীনতার উপায় অন্বেষণের ও বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন,'আমি জানি এই সভা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সভা। একথাও মানি যে সাহিত্য ও শিল্প সৃজনে ব্যক্তিত্বের স্থান কত বড়। কিন্তু যে-ব্যক্তিত্ব সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির উৎস বলে অনেকের ধারণা তারই একান্ত সাধনা আজ সাহিত্যে ও শিল্পে প্রগতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বলেই এই কথা আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই। কেন না যে-ব্যক্তিত্ববাদের ভিত্তিতে ধনিকতন্ত্র গড়ে উঠেছে ও যে-ধনিকতন্ত্রের নিশ্চিন্ত আওতায় বিশেষ এক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব পুষ্ট হয়েছে---ফ্যাসিবাদ সেই ধনিকতন্ত্রের চরম বিকৃতি ও সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর শেষ আশ্রয়।

একথা না মেনে উপায় নেই যে সাহিত্যে ও শিল্পে এই শ্রেণীর দান অবিস্মরণীয়। আজ এখানে কৃতী শিল্পী বা সাহিত্যিক যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলে না হলেও বোধহয় বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তবু আজ তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের সব চাইতে বড় পরিপোষক যে ফ্যাসিবাদ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন কী কারণে ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে আজকের দিনে যে-সংঘাত সমস্ত পৃথিবীকে নাড়া দিচ্ছে তা শুধু দেশের সঙ্গে দেশের , শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে শক্তিপুঞ্জের বা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাত নয়। এই সংঘাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সৃজনবৃত্তির সংঘাত। তাই,আজ পৃথিবীর সকল দেশেও সাহিত্যিকদের মধ্যে এই উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁদের সৃজনবৃত্তির যথার্থ মুক্তি নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থে অস্বাভাবিক পুষ্টিতে নয়---যে অগণিত জনসাধারণের দৈহিক পরিশ্রম এই শ্রেণী-আধিপত্যের ভিত্তি তাদেরই সঙ্গে একাত্মবোধে। সাহিত্যে ও শিল্পে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে তার প্রধান প্রেরণা এই বোধ। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায় এই বোধই আমাদের সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র।' তাঁর মতে, এই বোধ সুলভ নয়, অর্জনযোগ্য। সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে এই সামাজিক বোধ বা চৈতন্য অর্জনের প্রধান বাধা হল সাহিত্যিকের অভিমান। অভিমানের ভেতর দিয়ে সাহিত্যিক-শিল্পীরা যে জগৎ দেখেন, হিরণ সান্যালের মতে, তা হল কুয়াশা মাত্র, রহস্যাচ্ছন্ন, অতএব তা মিথ্যা। তাঁর মতে, সমসাময়িক বাংলাসাহিত্য এই মিথ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন। এই নিয়ে যত দলাদলি। আর সেইজন্যেই 'সাহিত্যশিল্পের চিরন্তন সম্পদরক্ষার অজুহাতে একদল যা অতি জীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াপ্রবণ তারই প্রচারের ব্রত গ্রহণ করে সমাজচৈতন্যকে বিষাক্ত করে তুলছেন। অপরপক্ষে প্রগতির নামে যাদুবিদ্যার উপর অত্যন্ত সুলভ জড়ের প্রলেপ দিয়ে কেউ বা উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন এই কথা ভেবে যে এই হল নবযুগের শিল্প আর কেউ বা প্রসঙ্গ দিয়ে শুধু প্রকরণের বিচিত্র উৎকর্ষ সাধনে নিজেরাও উদ্ভ্রান্ত হয়েছেন, পাঠকদেরও করেছেন উদ্ভ্রান্ত।' সমাজের ও সংস্কৃতির দুর্দিনে ফ্যাসিবাদী

শক্তির মোকাবিলার জন্যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অতঃপর তিনি আহ্বান জানান।[১৪৩]

নিয়মিত ফিচার 'কথাপ্রসঙ্গে'('অরণি' পত্রিকা) শ্রীঅনামী ওরফে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য এই সম্মেলনের মূল্যায়ন করে লিখেছেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ সান্যাল, হবিবুল্লা বাহার প্রমুখের অভিভাষণে ও সুচিন্তিত বক্তৃতায় 'সাহিত্যিকের স্বধর্ম ও সমাজের কর্তব্যের মধ্যে এতকালের সুমার্জিত কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে।' তাঁর মতে, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শও এতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে: 'শিল্পী ও লেখক সমাজ সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল-আমেরি-লিনলিথগোর মতো কেবল এ্যাক্সিস-বিরোধীই নন, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, তাঁরা সর্বপ্রকার অ-সামাজিক কৃত্রিমতার বিরোধী, ঘরের জগৎ আর বাইরের জগৎ এক চিরন্তন সমান্তরাল খাতে সুসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে বা চলা উচিত---এমন উৎকৃষ্ট উদ্ভট অতি-বিশিষ্ট দ্বৈতবাদেরও তাঁরা বিরোধী। এক কথায়, তাঁরা জীবন-বিরোধী সব কিছুরই বিরোধী।'[১৪৪]

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সংগঠনে, সৃজনশীলতায়, তৎপরতায়, আলোচনায় ও সমালোচনায় বিশিষ্ট একটি যুগের সূচনাবহ হয়ে উঠেছিল। কেবল ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেনি। এরপরই শুরু হয়ে যায় দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক বর্বরতা।

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা: ১৯৪৩

> ....'তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা পাতা নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হ'য়ে যাওয়ার ইতিহাস, মড়কে গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।'
>
> ---সুকান্ত ভট্টাচার্য
>
> 'কথা-মুখ', 'আকাল'-কবিতা সংকলন, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সারস্বত সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের সম্মিলিত অনুষ্ঠানের গভীর রাতে কলকাতার আকাশে প্রথম জাপানি-বোমারুর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। চট্টগ্রাম, ফেনী এবং পূর্ববাংলার অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে বোমাবর্ষণের পর কলকাতায় আক্রমণ শুরু হলে কলকাতাবাসীদের অনেকে শহর ছাড়তে বাধ্য হয়। আক্রমণকারীরা সর্বপ্রথমেই চেষ্টা করে সীমান্ত-অঞ্চলগুলিতে আতঙ্ক বিস্তারের, জনসাধারণ [illegible]

হয়ে পড়বে, কলকারখানার শ্রমিক-মজুরেরা উৎপাদনে বিপর্যয় এনে দেবে, যানবাহন চলাচল ব্যাহত হবে, দেশরক্ষার সামরিক ও বে-সামরিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ও শিথিল হয়ে পড়বে। শত্রুপক্ষ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে অস্থির অবস্থাই সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এই সময়। একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ (৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪২) যে এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পাঁচবার বিমান হানা দিয়েছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী প্রথম তিন হানায় ২৫জন নিহত ও ১০০জন আহত হয়েছেন। ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হয় মন্বন্তর। 'অরণি'র সম্পাদকীয়তে 'দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেওয়া হয়।'[১৪৫] ঐ সংখ্যাতেই 'কথাপ্রসঙ্গে' শীর্ষনামের এক নিয়মিত কীচারে শ্রী অনামী লেখেন, 'এ যুগে যে দুর্ভিক্ষ তা সাধারণতঃ খাদ্যাভাবে নয়, মূলত অর্থাভাবে। কিন্তু আজ দেখছি এ কাল আর সেকাল একাকার হয়ে গেছে। আজকের বৃটিশশাসিত ভারতের দুর্ভিক্ষ একসঙ্গে অর্থাভাবে ও খাদ্যাভাবে দুই-ই।'[১৪৬] এই দুর্ভিক্ষ হঠাৎই হয় নি। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মুদ্রাস্ফীতি আর তারপরেই দুর্ভিক্ষ---- বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারত তখন পরিণত হয়েছিল বৃহত্তর যুদ্ধঘাঁটিতে। দু'পাশের দুটি দেশ, পশ্চিমে ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্বে ব্রহ্মদেশ(বর্মা) ও মালয় ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ইতিমধ্যে জাপানের দখলে। সিংহল দ্বীপ ও ভারতীয় উপকূলভাগ জাপানের নৌ ও বিমান আক্রমণের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত---- ঠিক এই সময়ে চট্টগ্রাম-ফেনী-কলকাতায় বোমাবর্ষণ---- সর্বত্র যুদ্ধের আতঙ্ক যখন কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে (এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আক্রান্ত বর্মা থেকে শরণার্থী আশ্রয়প্রার্থীদের পূর্বভারতে আগমন), তখন কর্তৃপক্ষ 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিলেন যা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হল। বাংলাদেশের অসামরিক সরবরাহ-সচিব দুর্ভিক্ষের জন্যে বারটি কারণ নির্দেশ করেন:

১)১৯৪২-এ আউশ ফসল ভাল হয় নি, ২)১৯৪২-৪৩-এ আমন ধানের ফলনও কম, ৩)মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় প্রচণ্ড ঝড় হওয়ায় ফসল উৎপাদন কম, ৪)কীটের উপদ্রবে শস্যহানি, ৫)সরকারের নৌকা-নিয়ন্ত্রণ নীতি চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, ৬)সমুদ্রকূল থেকে লোক সরিয়ে নেবার জন্যে উৎপাদন হ্রাস, ৭)ব্রহ্ম ও আরাকান থেকে আগত শরণার্থীর ভিড়, ৮)শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ভিন্-প্রদেশের মজুরবৃদ্ধি, ৯)ব্রহ্মদেশ থেকে চালের আমদানী বন্ধ, কাজেই ঘাটতিপূরণ ব্যাহত, ১০)চাষযোগ্য জমিতে অনেক বিমানঘাঁটি তৈরি, ১১)সামরিক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খাদ্য-খরচও বৃদ্ধি, ১২)অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানী কম। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ করেছেন এই বলে যে, ৪নভেম্বর, ১৯৪৩-এ পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়ে গেছে তাতে মুদ্রাস্ফীতিকে দুর্ভিক্ষের কারণ বলে বর্ণনা করলেও বাংলার সরবরাহ-সচিবের দেওয়া বারটি সূত্রে তা অনুল্লিখিত। তিনি মন্তব্য করেন, 'অর্থাৎ তিনি (সরবরাহ-সচিব) গৌণ কারণগুলির উপর জোর দিয়া আসল ব্যাপার চাপিয়া গিয়াছেন।'[১৪৭] দুর্ভিক্ষ নিয়ে সে সময়

নানান সমীক্ষা হয়। সরকারীপক্ষে স্যার জন উডহেডও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের পক্ষ থেকে যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মৃতের সংখ্যা ৩৪লক্ষ বলা হয়েছিল, অন্যদিকে কালীচরণ ঘোষের বিখ্যাত পুস্তক 'ফেমিনস ইন বেঙ্গল'-এ মৃতের সংখ্যা ৩৫লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী পক্ষে উদাসীনতা সীমাবদ্ধ ছিল 'দরিদ্র জনসাধারণকে আর উৎপীড়িত করা চলবে না' এই আবেদনে ও সতর্ক-বাণীর দ্বারা। সর্বতোভাবে এই দুর্ভিক্ষের পেছনে ছিল সরকারী তরফে অবহেলা, আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি, সরকার-নিযুক্ত এজেন্টদের অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা, মজুতদারি, কালোবাজারি, মিলিটারি কন্ট্রাক্টরদের হাতে মজুতকৃত প্রচুরতর খাদ্যসম্ভার ইত্যাদি।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে রাজ্যকমিটি এই পর্বে রিলিফের কাজ সংগঠিত করতে 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন করে। কলকাতা টাউন হলে সম্মেলন করে এই সমিতি গঠিত হয়। সমিতির তরফ থেকে এই পর্বে 'দুধ-শিবির' সংগঠিত করবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

২৪মার্চ, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দীর্ঘ আবেদন: এই আবেদনে তিনি তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের দ্বারা সবাইকে সতর্ক হতে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'বর্তমান খাদ্য-সমস্যা এরূপই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদিগকে এই সমস্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে ধরণের ব্যবস্থা হইয়াছে উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ জানাইতে পারি। ...জনসাধারণকে এবং অন্নবস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতীকার সাধনের জন্য আমাদের সকলকে সমবেত চেষ্টা করা কর্তব্য। আজ আমাদের অস্তিত্ব বিলোপের উপক্রম হইয়াছে। জাতিকে বাঁচাইতেই হইবে। কাজেই সকলের নিকট আমার নিবেদন এই দুঃসময়ে পারস্পরিক বৈষম্য ও মতভেদ বিস্মৃত হইয়া এক সাথে চিন্তা ও কাজ করুন।'[১৪৮]

'জনযুদ্ধের' পক্ষ থেকে গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদক পাঠানো হয়েছিল দুর্ভিক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে। এরই ওপর অবলম্বন করে লেখা ৩১মার্চ, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কয়েকটি স্থানে দুধ-শিবির' শীর্ষক নতুন বিষয়সূচী সরকারী আমলাতন্ত্রের মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ে, ফলে বাংলা সরকার-এর হোম ডিপার্টমেন্ট (পলিটিক্যাল), ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে 'জনযুদ্ধ'-সম্পাদককে হুঁশিয়ার করে দিয়ে জানায়:

<u>সাবধানবাণী</u>

'৩১শে মার্চ ১৯৪৩-এর জনযুদ্ধে 'কয়েকটি স্থানে দুধ শিবির' শীর্ষক যে নূতন বিষয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি জনযুদ্ধ সম্পাদকের(র) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। ভারতরক্ষা আইনের ৩৭(১)(ডি) রুল ও ২৪শে মার্চ ১৯৪৩-এর ৩২৮-পি-আর নং মেমোরেন্ডামে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, এই নূতন বিষয়টি (দুধ শিবির) তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছে।

সম্পাদককে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যেন ভবিষ্যতে এইরূপ বিষয় প্রকাশ করা না হয়। ভবিষ্যতে

ইহার ব্যতিক্রম হইলে ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

স্পেশাল ব্রেঞ্চ এডভাইসার, কলিকাতা।'[১৪৯]

সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কঠোরতা কেবল দুর্ভিক্ষের সংবাদই নিয়ন্ত্রণ করে নি, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে সংঘটিত সাইক্লোনের সংবাদের ওপরেও একদা খড়্গহস্ত হয়ে 'যুগান্তর'-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ভদ্রের বন্ধন মুক্তি' রচনার জন্যে 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিস তিনদিনের মত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[১৫০] ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালের বাইরে থেকে অতঃপর কমিউনিস্ট কর্মীরা দুর্ভিক্ষে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পূরনচাঁদ যোশী পরিষ'দে লিখলেন 'জনযুদ্ধে'র বর্ষপূর্তিতে বাঙালি-কমিউনিস্ট কর্মীদের অভিনন্দিত করে বর্তমান খাদ্যসংকটে তাঁদের ভূমিকার প্রশংসা করেন ও কর্তব্য নির্দেশ করেন এই বলে: 'অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলায় খাদ্যসংকট অনেক বেশী। যখন দেখি এমনি সংকটের মাঝে খাদ্য ও সুনীতির জন্য বাংলার সমস্ত মানুষকে আপনারা এক করিতেছেন দেখিয়া বাংলার জনসাধারণ আপনাদের আশীর্বাদ করে তখন আমাদের বুক গৌরবে ভরিয়া ওঠে।...বাংলার দেশভক্ত সন্তানেরা! ভারতের সামনে গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করুন। সবাই একসাথে মিলিয়া খাদ্যকমিটি গড়িয়া তুলুন, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করুন। দলাদলি, দ্বেষ-বিদ্বেষ ছাড়িয়া সকল দলের মিলিত মন্ত্রীত্ব গড়িয়া তুলিয়া জনগণের জন্য খাদ্য আদায় করুন, জনসাধারণের দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলুন, শত্রুবাহিনীকে কোণঠাসা করুন, ভারতের পূর্বদুয়ারে আমাদের প্রিয়তম বঙ্গভূমিকে শেষরক্ত বিন্দু দিয়াও রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসুন। সমস্ত ভারতবর্ষ আপনাদের দিকে তাকাইয়া আছে। এই মহান কর্তব্য সম্পাদনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের পবিত্রস্মৃতি আপনাদের উদ্বুদ্ধ করুক।'[১৫১] একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি কর্তব্য নির্দেশ করেন যোশী। খাদ্যসংকটে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু সমাধানের রাস্তা খাদ্যকমিটি গঠনের মধ্যে, এই চিন্তাধারা সরকারকে প্রভাবান্বিত করবে কিনা অথবা তার আশু ফলপ্রসূ ব্যবস্থাই বা কী, এসম্পর্কে যোশীর কোন বক্তব্য নেই। 'মিলিত মন্ত্রীত্ব' গঠিত হলেই যে জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে এর নিশ্চয়তা বিষয়েও যোশীর বক্তব্য স্পষ্ট নয়। একই কথার প্রতিধ্বনি করে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন জুনের শেষদিকে একটি বিবৃতি দেন। বলেন, '...সমস্ত খাদ্যকমিটি, জনরক্ষা কমিটি এবং অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমাদের আবেদন যে---তাঁরা সভা করিয়া খাদ্য সংকটের সমাধানকল্পে মন্ত্রিমণ্ডলীর এই চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করুন। মন্ত্রীমণ্ডলী সরবরাহ বিভাগের অনাচার দূর করিবার জন্য যে দৃঢ় ব্যবস্থা লইতেছেন, তার পিছনে জনমত গঠন করুন এবং মজুতবিরোধী অভিযানকে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য যাতে সকল জায়গায় প্রতিনিধিমূলক খাদ্যকমিটি গঠন করা যায়, তার জন্য সাহায্য করুন।'[১৫২]... বাংলার সাম্প্রদায়িক লীগ মন্ত্রীসভাকে কমিউনিস্ট পার্টি সংকটসময়ে কেন

সমর্থন করেছিল ?প্রশ্নটা অবশ্যই নৈতিকতার তথা আদর্শের। এর উত্তর খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক ও সুর্বপ্রণোদিত। 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে('বাঙ্গালার সমস্যা') এর আসল বক্তব্যটা এইরকম:'এই নিদারুণ খাদ্যসঙ্কটের দিনে যাহাতে দেশে লুঠতরাজ না হয়, দেশরক্ষার ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়, পঞ্চম-বাহিনী প্রশ্রয় না পায়, এই কারণে কম্যুনিষ্ট কর্মীরা কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, কিষাণসভা সকল দলের লোক লইয়া জনরক্ষা ও খাদ্যকমিটি গঠন করিতেছেন। এই সাধু চেষ্টা এক শ্রেণীর শাসক বিকৃত করিয়া দেখিতেছেন এবং বিভিন্ন জেলায় এই শ্রেণীর কর্মীদের আটক, গ্রেফতার ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। এই অহেতুক পুলিশী উৎসাহ বন্ধ করিয়া স্যার নাজিম অবিলম্বে দেশপ্রেমিকদিগকে জনসেবার সুযোগ দিন।'[১৫৩] অনুমান অসম্ভব নয়, দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টির কাজকর্মগুলিও একেবারে অবাধ উন্মুক্ত হতে পারে নি। এই দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার করাল ছায়া বিস্তৃত করেছিল। ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এর ফলে। সমাজের উপরিতলের বিশৃঙ্খলা নিম্নগামী হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই দুর্ভিক্ষে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার জন্যে প্রতিটি মৃত্যু পিছু মূল্য ধার্য হয়েছিল এক হাজার টাকা।[১৫৪]

সবচেয়ে করুণতম এ সংবাদদেশের ভিত্তির ওপরে ঔপনিবেশিক শাসকের অটল সিংহাসন তবু টলে উঠল না, গান্ধী কিংবা অন্যান্য নেতারা কেউ মুক্তি পেলেন না, জাতীয় আন্দোলন তাঁদের মুখে সংস্থা স্তিমিত হয়ে পড়ল, অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপ জাতীয় আন্দোলনের অনেকখানি বিরোধী স্রোতে গা ভাসালো, কৃষকদের সংগঠিত হতে ও উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে সামিল হতে করুণতম আহ্বান জানালো। ১৪জুলাই থেকে ২০জুলাই, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দ, ফসল বাড়ানোর সপ্তাহ পালনের নির্দেশ দিয়ে পার্টি ঘোষণা করল, 'খাবার ফসল বাড়াইয়া এই সোনার বাংলাকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি দেশভক্ত কৃষকের কাজ।'[১৫৫] একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে বন্যা(বর্ধমান বিভাগ)----এই জটিল সংকটে দেশের জনসাধারণ তখন অসহায়, বিহ্বল। বন্যায় ত্রাণকার্যে গঠিত 'পিপলস্ ফ্লাড রিলিফ কমিটি'র পক্ষে ভবানী সেন(সম্পাদক, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি), এলা রীড(সম্পাদিকা, প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি), বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়(সভাপতি, নিখিল ভারত কৃষক সভা), আবদুল্লা রসুল(সম্পাদক, প্রাদেশিক কৃষক সভা), শঙ্কর রায়চৌধুরী(সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক আবেদনে তাঁরা জানালেন, 'আমরা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর নিকট আবেদন করিতেছি যাঁহার যথাসাধ্য দিয়া বন্যার্ত ভাই বোনেদের সাহায্য করুন।'[১৫৬] বলা বাহুল্য নয়, ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কাছে এর বেশি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া সদা সর্বদা তারা সরকারী নিষিদ্ধতার বিনিমুক্ত হয়ে সাংগঠনিকক্ষেত্রে মনোনিবেশ দিতে চেয়েছে।

* * * * * * *

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে এত সব বাধা সত্ত্বেও আপন লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে চ্যুত না হয়ে ক্রমে আরও বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল পরিণতি লাভ করেছে।

৬ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে লালফৌজের বিজয়ে এক অনুষ্ঠানে বাংলার নট, শিল্পী, সাহিত্যিক ও জনগণের একাংশ উপস্থিত হন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। উদ্যোক্তা 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। সভাপতিত্ব করেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। প্রত্যেক বক্তাই তাঁদের ভাষণে সোভিয়েট-লালফৌজের বিজয়ে 'অকুণ্ঠ উল্লাস' প্রকাশ করেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'সোভিয়েট দেশ এই দুনিয়ায় একমাত্র সভ্যদেশ---আজ তাহাকে বর্বরেরা আক্রমণ করিয়াছে। আমরা এখনও বর্বরতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই আজ যে লালফৌজ সেই সভ্যদেশকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের আমরা প্রণাম জানাই---কেননা তাহারা আমাদেরও আদর্শকে রক্ষা করিতেছে।'[১৫৭]

এই সময় 'অরণি'তে (৫ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০) প্রকাশিত হয় জর্জি ডিমিট্রভের 'লেখক সংঘের প্রতি' নিবেদন, যা লেখক সংঘকে পরবর্তীকালে নানান প্রেরণা দিয়েছে। তিনি এই আবেদনে আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করবার পরিবর্তে বর্তমান প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক সাহিত্যের মধ্যে কয়েকটি ত্রুটির প্রতি (নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখেন। বর্তমান বক্তব্য জর্জি ডিমিট্রভের ব্যক্তিগত না তা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেরও, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত তথ্যপ্রমাণ মেলে নি, তবুও এর মূল্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তিনি বলেন, 'কমরেডগণ! আমাদের সাহিত্যে কোথায় এইসব নায়ক যারা জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশের শ্রমিক আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন? লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে? বিপ্লবী মনকে শিক্ষিত করে তুলবার ব্যাপারে সাহিত্যের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন, শ্রমিক-সঙ্ঘকে সাহায্য করুন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে সাহায্য করুন। কাব্য, উপন্যাস ও গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুন। সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়ে তরুণ বিপ্লবী নেতাদের মানস গড়ে তুলুন।' ডিমিট্রভ মনে করেন যে, একসময়ে বিপ্লবী বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে সাহিত্যকেও হাতিয়ার করে গড়ে তুলেছিল, নাইট-সম্প্রদায়কে সার্ভেন্টিসের ডন কুইক্সট-এ হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছিল কেবলমাত্র সামন্ততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের প্রতি তীব্র আঘাত করবার প্রেরণা থেকে। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কাছেও তেমনি ডিমিট্রভের প্রত্যাশা একজন সার্ভেন্টিস। তিনি তাই ফ্যাসিজমের বিরোধী-সংগ্রামে ডন কুইক্সট-এর মত সংগ্রামী চরিত্র সাহিত্যে দেখতে চান। তিনি স্বীকার করেন, 'আমাদের বিপ্লবী সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে সব সময় আমি ধৈর্য রাখতে পারি না, অবশ্য, আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। জনসাধারণকে যতদূর জানি, মজুরদের মনোবৃত্তির

যতদূর পরিচয় পেয়েছি, তাতে মনে হয়, আমাদের বর্তমান সাহিত্য তাদের মনোরঞ্জন করতে পারে না। শ্রমিকরা এই সাহিত্য পাঠ করে এমন কোন আদর্শ বা দৃষ্টান্ত পায় না যা তারা অনুকরণ করতে পারে। শুধু "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" লিখলেই বিপ্লবী লেখকের কাজ ফুরিয়ে যায় না। তাদের মূল কর্তব্য হ'চ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে চূড়ান্ত বিপ্লববাদ প্রচার করা, শত্রুর বিপক্ষে তাদের সংঘবদ্ধ করা।'

প্রসঙ্গত তিনি লেখকদের নির্দেশ দেনঃক) সাহিত্য যেন শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হয়, খ) ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ গ) জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ ও বিপ্লববাদে দীক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সাহিত্যিকের, ঘ) রাজনীতি-বিমুখ ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে চূড়ান্ত বিপ্লবী-চেতনার প্রসার ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিরাট সংগঠনের কাজ চালাচ্ছে তাকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্বও সাহিত্যিকদের বহন করবার পরামর্শ দেন। পরিশেষে তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যে বিরাট বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, সাহিত্যের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করা। সাহিত্যের মূল সার্থকতা এখানেই।'[১৫৮]

গণসংগঠনের প্রতি এ সময় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়। ২২এপ্রিল, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'সুর-শিল্পী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি বার্ষিক। সুধী প্রধান প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, এটা গড়ে ওঠে গত ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে। সংগীত জগতে স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। খ্যাতনামা অনেক শিল্পী এতে যোগ দেন। 'এই প্রথম বাংলার সুরশিল্পীরা তাহাদের শিল্পকে বাঁচাইতে, নিজেদের ও জনগণকে শোষণের হাত হইতে মুক্ত করিতে বাংলার জনসাধারণকে ডাক দিলেন---জনগণের সঙ্গে ঐক্য ঘোষণা করিলেন---এবং সর্বাঙ্গীণ ঐক্যই যে একমাত্র পথ এ কথা মানিয়া লইলেন।' পুরাতন কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি সাধন গুপ্ত, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের বিনয় রায়। বিনয় রায় এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য সুর-শিল্পীদের সঙ্গে 'আসেয়া দিন স্বাধীনতা কা, আগে চলো আগে চলো ভাই' গানে অংশ নেন। 'বাঁধ ভেঙে দাও' রবীন্দ্র-সংগীতটিও এখানে পরিবেশিত হয়। তারাশঙ্কর এই সংঘকে (আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশন) অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন। শচীন দেববর্মন, কমল দাশগুপ্ত, শৈল দেবী, শান্তিদেব ঘোষ একক সংগীত শোনান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, শৈলজা মজুমদার, কনক দাস প্রমুখ শিল্পীরা। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে কমরেড বিনয় রায় সংঘকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন ঃ'সুর-শিল্পীদের এই চেষ্টা জীবনে আশার সঞ্চার করে। দেশের এই দারুণ দুর্দশার দিনে সুরশিল্পীরা সংগীতের মধ্য দিয়া যে সজীবতা দেশের মধ্যে ছিটাইয়া রাখিয়াছেন---শিল্পীদের পক্ষে ইহাই দেশভক্তিরই নিদর্শন---এবং দেশ ইহাতে বাঁচিবার ও বিপদ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রেরণা পাইবে। শিল্পীরাও শোষিতশ্রেণীর সঙ্গে---শিল্প আজ সহজে অনুরাগীদের কাছে পরিবেশিত হইতে পারে না---রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা

নানারকমের বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীন সংযোগ কোথাও নাই। তাই আজ ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার প্রয়োজন হইয়াছে এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের রাজনীতি আসলে এই এ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু রাজনীতি দরকার হয়---তাহাই। তাই আজ এই দুটী সংঘ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা করিবে---এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এই আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশনকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে।' বক্তৃতার পর 'এক সুরে বাঁধা আছে সহস্র জীবন' গানটি গীত হয়।[১৫৯]

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তরফে ও স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে শাখাসংগঠনগুলি এই সময় বহু বিস্তৃত হয়ে ওঠে। গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে ছাত্রফেডারেশন ও 'অভিযান' পত্রিকার উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সংঘের স্থানীয় শাখার জন্যে একটি সংগঠকসমিতি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নৈহাটিতে ১৮এপ্রিল (১৯৪৩) উক্ত স্থানীয় প্রগতি সংঘের উদ্যোগে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হয় ২মে(১৯৪৩) তারিখে। দিনাজপুরের ড্রামাটিক হলে ২৮ ও২৯ এপ্রিল (১৯৪৩) ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে ও সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে সংস্কৃতি সম্মেলন হয়। প্রথমদিন 'জনবার্তা', 'জনসংগীত' ও চিত্রপ্রদর্শনী হয়। শিল্পী বীরেন দাশগুপ্ত-এর বহু চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।[১৬০]

১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দের বড় ঘটনা হল স্টালিনের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশী একটি বিবৃতিতে (২৬মে, ১৯৪৩) বলেন, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার দ্বারা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিকের নিয়মের প্রতি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতি বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে। ......এই প্রস্তাব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের সংস্কারের মূলে আঘাত হানিল। তাহার ফলে প্রত্যেক দেশে ব্যাপকতম জাতীয় ঐক্য আজ গড়িয়া উঠিবে, সম্মিলিত জাতির সভাদের মধ্যে এক পূর্ণ মিলিত চেষ্টা আসিবে যাহাতে ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ মৃত্যু-আঘাত হানিতে পারা যায়। জগতের সমস্ত জনগণের মুক্তি তাহাতেই আসিবে এবং তাহার মধ্য দিয়াই সমাজতন্ত্রবাদের বিজয়ের ভিত্তিভূমি তৈরী হইবে সমস্ত দুনিয়াব্যাপী---যাহা ইতিপূর্বে হইতে পারিত না।'[১৬১]

মে মাসের(১৯৪৩) প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় বোম্বে শহরে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মাও সে-তুঙ এক অভিনন্দনবার্তা পাঠান।[162] চিঠিটি লেখা হয়েছে ১জুন, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসকে সফল বলতে হবে। এঁদের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রফেডারেশন, কিষাণ সভা, মহিলা সমিতি, কিশোর-বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের ও অগণিত দর্শকদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল সেদিন। গণ-সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির এই অস্তিত্ব খুবই উজ্জ্বল। বলা দরকার, এই গণসংগঠনেরই আর একটি রূপ কালচারাল স্কোয়াড সংস্কৃতির প্রসারে জনগণের সান্নিধ্যচারী হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় তৎপরতা প্রদর্শন করে।

বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের পাশাপাশি 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'রও অধিবেশন বসে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('জনযুদ্ধে'র সংবাদ-প্রতিবেদক হিসেবে) কিংবা চিন্মোহন সেহানবীশ ('অরণি'র সংবাদ-প্রতিবেদক হিসেবে) কেউই উল্লেখ করেন নি কত সংখ্যক সম্মেলন এটি। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'অভিনব সংস্কৃতি উৎসব'[163] শীর্ষনাম কেন ব্যবহার করেছেন বোঝা দুষ্কর। এর আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন হয়, যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ছিল এর অন্যতম আকর্ষণীয় অঙ্গ বিশেষ। কেউ কেউ একে তৃতীয় সম্মেলন বলেছেন। 'পিপলস পাবলিশিং হাউস', বোম্বে থেকে প্রকাশিত এস. এ. ডাঙ্গের(মারাঠী বিভাগ) 'লিটারেচার এ্যান্ড দ্য পিপল' পুস্তিকায় পুনঃপুনঃ একে চতুর্থ সম্মেলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮মার্চ, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে রামগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনটি কি তাহলে তৃতীয় সম্মেলন? ২০মার্চ, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে এই সম্মেলনের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সংখ্যাটিতে। কিন্তু কত সংখ্যক সম্মেলন বা কোন অধিবেশন এ বিষয়ে বিশদ তথ্যের অপ্রতুলতা হেতু এর সংখ্যা নির্দেশ করা গেল না।

২২মে, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে, বিকেল থেকে এই সম্মেলন শুরু হয়। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু এঁদের অনুপস্থিতির কারণে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। উর্দু সাহিত্য থেকে কবি যোশ মলিহাবাদী, মারাঠী থেকে এস. এ. ডাঙ্গে, গুজরাটী থেকে জীতুভাই মেহেতা, হিন্দী থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কানাড়ী থেকে প্রফেসর কাশীরদার, তেলেগু থেকে তাপী ধর্মরাও প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলার শিল্পীরা দেবব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটি পরিবেশন করেন। গানটির ইংরেজি তর্জমা অবাঙালিদের আগে শোনানো হয়, পরে এক পোলিশ ভদ্রমহিলা তর্জমাটি সাগ্রহে সংগ্রহ করে নেন। পরদিন(২৩মে) বাংলা গানের সঙ্গে ভজন প্রচার হলে সাহিত্য সম্মেলনের অধ্যায়

অধিবেশনে গান পরিবেশিত হয় নি। বিকেলে(২৩মে,১৯৪৩) কামগার ময়দানে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়---মাঠের এক প্রান্তের মঞ্চ দেশনেতা গান্ধী, জিন্না, নেহেরু ও যোশীর প্রতিকৃতি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। শিল্পী চিত্তপ্রসাদ কর্তৃক এগুলি অঙ্কিত হয়। বক্তা ছিলেন ডাঙ্গে,(ট্রেড-ইউনিয়ন), বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়(কিষাণ সভা), আর ছিলেন শ্রমিক নেত্রী সুকন্নী বাঈ। রাত ৯টায় প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হয়। প্রতিবেদক চিন্মোহন সেহানবীশ এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম দিয়েছেন:'সমগ্র পৃথিবীর সামনে যে ফ্যাসিস্ট বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাকে প্রতিহত করে নূতন সমাজচেতন সংস্কৃতি গড়ার সুদৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন করে মূল প্রস্তাবটি রচিত হয়। এটি ছাড়া সোভিয়েট ও চীনা লেখক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে, অবরুদ্ধ ভারতীয় নেতা ও প্রগতি-সাহিত্যিকদের মুক্তির দাবী করে, কাগজসম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদে ও গণনাট্য-আন্দোলনকে সমর্থিত করে বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।'

অনুষ্ঠানে সকলের মন গভীরভাবে স্পর্শ করে যায় রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি। এই সম্মেলনে নিখিল ভারতীয় লেখক সংঘের সম্পাদক পদে উর্দু সাহিত্যিক সাজ্জাদ জহীর, আব্বাস ও বিষ্ণু দে যুগ্ম সহ-সম্পাদক, মামা ওয়ারেরকার কোষাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন।

পরের দিন(২৪মে,১৯৪৩), দামোদর থ্যাকারসে হলে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বে, অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। বিচারক ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যুক্তরাষ্ট্রের(সম্ভবত 'যুক্তরাজ্যে'র হবে) হাওরা বেগম ও চাষী। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অন্ধ্র, দ্বিতীয় বাংলা, তৃতীয় কেরল অধিকার করে। বাংলার গান ও নিবারণ পণ্ডিতের পাঁচালী, অন্ধ্রের লোকশিল্প ছিল প্রভূত আকর্ষণের বিষয়। বিনয় রায়ের উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা 'চাষী সেখিনার গান 'হই হই হই' পরিবেশিত হয়। ২৫মে,(১৯৪৩)-এ গণনাট্য সম্মেলনের অধিবেশন। সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য(অনুপস্থিত)-এর পরিবর্তে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেইদিন সন্ধ্যায় 'নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘে'র পক্ষ থেকে দামোদর হলে বিভিন্ন প্রদেশের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশ থেকে বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' অভিনীত হয়। ২৮মে সন্ধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রাদেশিক দলগুলির নাচ, গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। বাংলা থেকে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন'-এর সামগ্রিক সফলতা ও মণিকুন্তলা সেনের অভিনয়পটুত্ব প্রশংসার দাবি রাখে। ২৯মে কামগার ময়দানের প্রান্তে দশ হাজার দর্শকের সামনে প্রাদেশিক নৃত্যানুষ্ঠানও ছিল আকর্ষণীয়। চাষী প্রসঙ্গত তাঁর ভাষণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে

অতিবড় প্রয়াসের সূচনা করেছে তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'A new culture is rising before our very eyes, a culture shaped on the anvil of inescapable necessity and under the hammer-blows of the Communist Party of India.'[১৬৪]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবেদনের পরিসমাপ্তিতে এই সম্মেলনের সংস্কৃতি উৎসব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, '...কম্যুনিস্ট কংগ্রেসের সংস্কৃতি উৎসব অন্তত একটা জিনিষ পরিষ্কার করে দেখিয়েছে যে জনসাধারণের মনে আজ আলোড়ন এসেছে আর সে আলোড়নের ধারা পড়ছে নতুন শিল্পে, নতুন সাহিত্যে।'[১৬৫]

সাজ্জাদ জহীর সাহিত্যিকদের এই সমাবেশ সম্পর্কে অন্যত্র মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমস্যাবলী আলোচনার জন্য এই লেখকরা যে একত্রিত হয়েছিলেন তার থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁরা আমাদের দেশের সমস্ত সৎ ও দেশপ্রেমিক-বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একটি যৌথ প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে আগ্রহী। বর্তমানে, যে সময়ে আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ফ্যাসিস্ট বর্বরদের হাতে অভাবিতরূপে বিপন্ন, প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি, তাতে করে তাঁরা স্বদেশের প্রতি কর্তব্য করতে পারেন এবং জনগণকে সংঘবদ্ধ হতে, বন্যা ও মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সংস্কৃতি ও নীতিবোধে (স্পিরিচুয়ালি) একনিষ্ঠ হতে সাহায্য করতে পারেন।' শেষে আরও বলেন, 'It is obvious that before our writers can perform these tasks it is necessary that they themselves should draw inspiration and moral sustenance from the people — their inexhaustible resourcefulness, their limitless Patriotism, their capacity to stand up to any difficulties and not to give up until it has been solved and victory achieved.'[১৬৬]

এস. এ. ডাঙ্গে এই সম্মেলনে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মানবস্বাধীনতা এখন আতঙ্কিত ও আশঙ্কিত। লেখকেরা এই পরিস্থিতিতে বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। জনগণের থেকে তাঁরা এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নও থাকতে পারেন না। সাহিত্যিকরা তাঁদের সমুন্নত চিন্তাশক্তি দিয়ে, রচনাশক্তি দিয়ে, সংগীত দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের কাছে আসতে পারেন। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে চীনা জনগণ যেমন জাপানি ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে, স্পেনের জনগণ যেমন ইটালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন জার্মানির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আমাদের দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব আমাদেরও সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করতে, প্রাণিত করতে পারে। ভারতের জনগণ এ বিষয়ে একটি বড় নিঃসংশয়ে থেকে

দিয়েছেন, তাঁদের ভাষায়: 'The Indian people have chosen their sides — they stand for the defeat and destruction of Fascism, which aspires to enslave the whole world and destroy all national cultures. Our great humanist and world renowned poet Tagore, therefore, spurned all advances for fraternisation made by the Japanese Fascist Scribbler Noguchi.' এ অবস্থায় নিরপেক্ষতার কোন অর্থ হয় না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'We stand against Fascism and for its complete destruction in this war. We choose sides against Fascism and for the liberation of all nations and peoples of the world.'

সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তোলেন। শিল্প শিল্পের জন্য---এই মতবাদের তিনি বিরোধিতা করেন। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে সাহিত্যের সব শাখায় আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি বর্তমান সময়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'I only emphasis the need of the hour, the need of the people, the demands of the people on their artists. Defence of the country against fascism, against the hoarder and profiteer, against famine. Unity of the people with complete freedom for every nationality to work that unity in its own independent way and thus forward to our national liberation. The people demand of their artists to present these in art-forms, to clothe these sacred emotions and feelings in inspiring, binding, mobilising pictures of pen and pencil.'[১৬৭]

অগাস্ট, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রতি চরম আক্রমণ নেমে আসে। গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন কণী চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ অঞ্চলের কমিউনিস্ট কর্মী। আক্রমণে আহত হন 'প্রতিরোধ' পত্রিকা ও ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত। আহত হন আর সোমেন দাশগুপ্তও। 'পঞ্চম বাহিনী, নিপাত যাউক' এই শিরোনামে 'জনযুদ্ধে'র সম্পাদক লেখেন, 'পঞ্চম বাহিনীর গুপ্ত ঘাতকেরা কমিউনিস্ট ও আত্মকেতারেশনের কর্মীদের ছোরা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকা শহরে একজন, নারায়ণগঞ্জে তিনজন ইতিমধ্যে আহত হইয়াছেন। ময়মনসিংহে একজন ছাত্রকর্মী গুপ্ত ঘাতকের আঘাতে

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।...

'কমিউনিস্ট পার্টি গত একবছরে অদমনীয়ভাবে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি অন্ন যোগাইবার আয়োজন করিয়া, ক্ষুধার্তের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিয়া, খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলের সহযোগিতায় খাদ্যকমিটি গড়িয়া সংকট সমাধানের জন্য লড়িতেছে। কমিউনিস্টরা এবং সারা বাংলায় খুব কমপক্ষে একলক্ষ বিঘা জমিতে অন্ন যোগাইয়াছে, চট্টগ্রামে শতাধিক খাদ্যকমিটির সাহায্যে প্রতিদিন ৪৬০০০ নরনারীকে ক্ষুধার অন্ন জুটাইতেছে, জাপদস্যুদের নিষ্ঠুর বোমা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।......'কমিউনিস্ট পার্টি গুপ্তহত্যার ভয়ে মরিবার পাত্র নয়। যাহারা স্বদেশপ্রেমের জন্য ফাঁসিকাঠে যাইতে কসুর করেনা, বছরের পর বছর থাকিয়াও যাহাদের স্বদেশপ্রেম ম্লান হয় নাই, নিদারুণ দমননীতির বিরুদ্ধে যাহারা দিনের পর দিন লড়িয়াছে এবং লড়িতেছে---সেই বীর স্বদেশসেবকেরাই আছে কমিউনিস্ট পার্টিতে।'...১৬৮

ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত-এর প্রতি আক্রমণের নিন্দা করে 'নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নিখিল ভারত জননাট্য সংঘে'র বঙ্গীয় শাখার সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে একটি বিবৃতিতে বলেন,

'শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্ত অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ফ্যাসি- বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। যাঁহারা ফ্যাসিস্ট শক্তির সহায়তায় দেশের মুক্তির কল্পনা করেন এবং সেই কারণে হিংসাত্মক গুপ্ত আন্দোলনে লিপ্ত, শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্তের কার্যকলাপ যাঁহাদের কর্মপন্থার অন্তরায়---এই হিংসাত্মক আক্রমণ তাঁহাদের বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রায় দেড় বৎসর আগে সোমেন চন্দকে এমনি ভাবেই হত্যা করা হইয়াছিল।

ফ্যাসিস্টশক্তির সহায়তায় কোনও জাতির মুক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি না, মহাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাষ্ট্রনৈতিক নেতা এই কল্পনা ভ্রান্ত বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ভ্রান্ত মুক্তিপন্থা অনুসরণের মর্মান্তিক স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া আছে, আজও তাহার মাশুল আমাদের দিতে হইতেছে। এই পন্থা অনুসরণে গভীরতর দুর্দশা আমাদের জীবনে নামিয়া আসিবে। শিল্প, সাহিত্য, জীবনাদর্শ বিপন্ন হইবে ---ধ্বংস হইবে।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর বাংলার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীরা একত্রিতভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া ছিলেন এবং সেই প্রেরণা হইতেই সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ফ্যাসিস্ট- বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করিয়াছেন।

আমরা সবিনয়ে জানাইতেছি যাঁহারা এই হিংস্র অসহিষ্ণু এবং আত্মঘাতী নীতি পোষণ করেন তাঁহারা

উহা বর্জন করুন। যে আচরণ সংঘটিত হইয়াছে আমরা দৃঢ়ভাবে যুক্তকণ্ঠে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি, এই সর্বনাশা নীতির নিন্দা করিতেছি।'[১৬৯]

এই পর্বে কংগ্রেস নামক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কারের নির্দেশ জারিত না হলেও কোন কোন সদস্য এই চেষ্টায় নিয়োজিত হন। হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা কমিউনিস্টদের মধ্যে সন্ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার করা হচ্ছিল। কোথাও কোথাও হিংসাত্মক আক্রমণ-ও সংঘটিত করা হয় তাদের ওপর। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্যা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের নামে এই হিংসাত্মক কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে একাধিক বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহাদের অবর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এমন কোন অধিকার দেন নাই যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কংগ্রেসের নামে কোন কার্যক্রম চালু করিতে পারে। আমি জোর করিয়াই জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দিতে চাই যে এইসব লোক কংগ্রেসের নামে হিংসাত্মক কাজ করিয়া কংগ্রেসের মূলনীতি লঙ্ঘন করিয়াছে।'[১৭০]

ফ্যাসিস্ট বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলবার অনুরোধ জানিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে মাও সে-তুঙ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের দুটি পত্র লেখেন। স্মরণযোগ্য যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস চীনের প্রতি প্রথম থেকেই সহানুভূতিশীল। কিন্তু বর্তমানে যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছে উভয় দলে তার পরিপ্রেক্ষিতে মাওয়ের চিঠির গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এতে বলা হয়: ...'আজ যখন এই চরম মুহূর্তে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম জয়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, তখন আমরা আপনাদের এই প্রচেষ্টার সাথে নিবিড় সংযোগ অনুভব করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের উদ্যোগ ও চেষ্টায় আপনাদের সংকটের অবসান হইবেই।'[১৭১]

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশে লিখিত পত্রে চীনের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করার কথা সপ্রশংসভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৭২]

দুটি চিঠির গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেকখানি। 'জনযুদ্ধে' এগুলি প্রকাশের কারণ এই যে, ভারতের দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীই ভারতের স্বাধীনতা চায়, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসার আকারে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তার ফলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামই ব্যাহত হবে, সুবিধে হবে ফ্যাসিবাদের, এর থেকে মুক্ত থাকার পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন মাও তাঁর 'জনযুদ্ধে' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার প্রচার চেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি। একই অনুষঙ্গে জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রে ও জানা' (সম্পাদক)

কর্তৃক লিখিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে পত্রটির উদ্দেশ্যও আমাদের জানা দরকার, এতে স্পষ্ট করে বলা হয়ঃ ......'আমরা বিশ্বাস করি ভারতবাসী পৃথিবীর সমস্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী সর্বদেশের ও জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া প্রাচ্যের জনসাধারণের এই নিষ্ঠুরতম ও রক্তপিপাসু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ইহাকে পরাজিত করিবে।

'সমস্ত প্রাচ্যের জনসাধারণের এই একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা ভারতবাসী ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহযোগিতা জানাইতেছি।

সমস্ত ভারতবাসীকে বলুন জাপফ্যাসিস্টরা ভারতকে স্বাধীনতা দিবার যে বুলি কপচায় তাহা যে কত বড় নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজী মাঞ্চুরিয়া ও নানকিং-এই তাহার পরিচয়। ১৯৭৫ ...

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই অবস্থায় নানান বিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে।১নভেম্বর থেকে ৮নভেম্বর(১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দ) জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ পালনের নির্দেশ দেয় এই পার্টি---ইস্যুগুলি হলঃদেশবাসীকে বাঁচানো, নেতাদের মুক্তি, জাতীয় সরকার গঠন ও দেশরক্ষা। ইতিমধ্যে পার্টির কালচারাল স্কোয়াড পাঞ্জাব থেকে সংগ্রহ করে একলক্ষ টাকা, দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন নিয়ে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে এই দলটি সেখানে যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ছিলেন হারীন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রীও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। চীনে মাদাম চিয়াং কাইশেক-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডিয়ান ফেমিন রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন' দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে১৪নভেম্বর(১৯৪৩) -এ ভারতের দুর্গত জনসাধারণের উদ্দেশে প্রেরণ করেন।

বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় যে সংস্কৃতি আন্দোলন, তার ভূমিকা কী, কতখানি, এসব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা এই সময়ে শুরু হয়ে যায়। মূল্যায়নে, বিশ্লেষণে , সার্থকতা বা ব্যর্থতার পর্যালোচনায় কিছু কিছু সূত্রনির্ণয়ে এর আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতির ওপর বিশেষ আবেগতাড়িত ঝোঁকও লক্ষিত হয়। 'অরণি'তে প্রকাশিত 'সংস্কৃতি-আন্দোলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে রাশিয়ান লেখকরা ----যেমন, শলোকভ, গ্ল্যাডকভ, এলেক্সি, টিখনভ প্রমুখ জনগণ থেকে সরে আসেন নি, বরং শিল্পপ্রেরণার উৎস হিসেবে জনগণই মুখ্য হয়ে উঠেছেন তাঁদের সাহিত্যে, সেদিকে প্রাবন্ধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন চীনের শিল্পীরা কিভাবে সমর-সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের সৈনিক-কর্তব্য পালন করেছেন। গ্রাম্য-সংগীত, লোকগাথা, লোকনৃত্য-এ তাঁরা নতুন প্রাণ নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন, নাট্যশিল্প হয়ে উঠেছে প্রকৃত গণসংযোগের নিবিড় মাধ্যম তাঁদের কাছে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃতি আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যঃ'বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এই বর্তমান প্রচেষ্টার বার্তা

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃজনীশক্তি যখন মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিকে বিকাশের চরমে এনে পৌঁছে দিল তখন বাংলার মধ্যবিত্তসমাজে ভাঙনের ফাটল দেখা দিয়েছে। সে-সময়ে সুন্দরাচারী শিল্পীদের চোখের সামনে সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে আর কোন পথই খোলা রইল না। 'শেষ চেষ্টা হিসেবে কেউ কেউ বাগ্‌ বিন্যাস করেছেন---'কেউ রচনাকে দুর্বোধ্য করে মৌলিকতা সৃষ্টির প্রয়াসী হলেন, কেউ বা বাস্তব পৃথিবীকে বাদ দিয়ে সুরের অনুভূতি দিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন, কেউবা চালালেন শিল্পের নামে উচ্ছৃঙ্খল যৌনাভিযান। তাঁদের কারো শিল্পই সাধারণ মানুষের বৃহত্তম সমাজের দিকে প্রাণশক্তি দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে অন্তঃসারশূন্য রুচিজ্ঞানবর্জিত শিল্প ঘুরে ফিরে ক্রমশঃই যেন আরও পিছিয়ে চললো। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রগতিবিরোধী শিল্পপ্রচেষ্টাকেই তখন প্রগতির নামে চালিয়ে শিল্পপিপাসুদের চোখ ধাঁধানো হচ্ছিল।' 'সমগ্র জাতীয় জীবনের ওপর সংস্কৃতি আন্দোলনকে তিনি সংস্থাপিত করতে চান, দেশের সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, লোকগাথা, লোকশিল্প, যাত্রাগান, চিত্রশিল্প, পটশিল্প, নানান সুতন্ত্রপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান এই সংস্কৃতিরই বিশেষ বিশেষ দিক আলোকিত করে সমাজ-প্রবাহের জীবনধারাকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী করে নিয়ে যায়। সেদিনের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি অতঃপর বলেন, 'প্রাচীন সংস্কৃতিবিরোধের কোন গোঁড়ামিই যেন তাঁদের প্রচেষ্টাকে আচ্ছন্ন করে না রাখতে পারে।'[১৭৪]

মুশকিল হলো এই ধরনের রচনা বা আলোচনার অনেকটাই অস্পষ্টতার ওপর ভর করে থাকে বলে এসব নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা সম্ভব নয়, কে বা কারা রচনায় দুর্বোধ্যতা আনলেন, সুরের অনুভূতি সঞ্চার করলেন, প্রগতিবিরোধী শিল্পপ্রচেষ্টার স্বরূপ কী, অথবা আমাদের দেশে সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে, লোকশিল্পে যে নতুন রুচি গড়েছে তার বিশদ বিবরণ কোথাও উপস্থাপিত হয় নি---দাখাতগুরুত্বহীন এই রচনার মূল্য প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আত্মসমালোচনাকেও স্বীকার করে নি---তাহলে এর মূল্য কোথায় ? মনে রাখতে হবে, সময়টা এ জাপানি আক্রমণের সময়। ফ্যাসিস্টরা জাতীয় জীবনকে অস্থির করে তোলে, শিল্প-সংস্কৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়---জাতীয় সংকটে তাই শিল্পীর দায়িত্ব সামান্য নয়, একটা সুনির্দিষ্ট কমিটমেন্ট তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। বলাই বাহুল্য, এই প্রয়াস প্রবণতা বাঞ্ছিত। এরই সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে 'দেশের মুক্তিকামনে জলে-বায়ুতে পরিস্ফুট সংস্কৃতি-পুষ্প'কে---এই আহ্বানই তখন শিল্পপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বড় আহ্বান, বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দে শিল্প জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা---এই বাণীই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি নির্মাণে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে বলে আমাদের ধারণা। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিল্প ও শিল্পীর দায়িত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উচ্চারণ করেছেন : ...'প্রকৃত গণশিল্প সৃষ্টির জন্যে শিল্পীর চেতনার গভীরতা এবং জনগণের মানসিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় পরিচয় থাকা

একান্ত প্রয়োজন।' তিনিও রবীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি করে রাশিয়া ও চীনের শিল্পী ও জনগণের নিবিড় জনসংযোগের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং তার তুলনা করে বলেছেন,'... আমাদের শিল্পীদের মধ্যে এখনও এই ধরনের কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা যায় না।' এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে:'লেখক ও শিল্পীদের আভিজাত্য বা নিজের সামাজিক বা পারিবারিক বা মানসিক, যে-কোন কারণেই হোক বস্তীতে-বস্তীতে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে শিল্পসৃষ্টির জন্যে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করবার মত উৎসাহ এবং উপলব্ধি আজও অধিকাংশ শিল্পীরই নেই। জনগণের সঙ্গে সংযোগহীন এইসব শিল্পীদের লেখাও তাই জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। এইসব সৃষ্টি শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি ও মানসিক বৃত্তিরই পরিচয় দেয়, জনসাধারণের সমষ্টিচেতনার পরিচয় দেয় না।' তিনি মনে করেন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে না, স্বীকার করেন, কংগ্রেস ও লীগের এ বিষয়ে নীরবতা অনেকখানি দায়ী। বলেন,'...লেখক ও শিল্পী সংঘের আজ সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এই শত্রু এবং কেমন করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেই প্রাথমিক কাজে। দেশের লোক মনে করে দেশের একমাত্র শত্রু দেশের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু স্বাধীনতালাভ করতে হলে আজ যে এক নূতন সংগ্রামপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, আর এক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে এই কথা আজও দেশবাসীর উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। আজও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থই যে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের (সেই সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের) বিরুদ্ধে লড়াই এ কথা তারা জানে না। বরং তারা মনে করে সে-লড়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের, সে-লড়াইয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই স্বার্থ।' প্রসঙ্গত তিনি বর্তমানে উদ্ভূত যে দুর্বিষহ প্রেক্ষিত---অর্থ-উপার্জনের সমস্যা, দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যসমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি বা দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় কয়লাসমস্যা ও বস্ত্রসমস্যা----শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির অনেক অনেক সময় কেড়ে নিচ্ছে বা অনুকূল সৃষ্টির অন্তরায় ঘটাচ্ছে, শিল্পীসংঘের থেকে তিনি এর অনুসন্ধান ও প্রতিকার দাবির সঙ্গে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির কাজে সুষ্ঠুতার সঙ্গে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন---কারণ, সমস্যা থেকে সরে গেলে সমস্যার কখনও সমাধান হয় না, জীবনকে গ্রহণের মধ্যেই এই অঙ্গীকারের সঠিক ফলশ্রুতি থেকে।[১৭৫]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন----অবরোহণপর্ব : ১৯৪৪-'৫০

আমরা বর্তমান পর্বের আলোচনায় এরকম শিরোনাম কেন দিলাম, প্রথমে সেটাই বিশদ করা জরুরি। মনে রাখতে হবে, যে, ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রথম কংগ্রেস বসেছিল, তাতে সাংগঠনিক এমন কোন প্রস্তাবই আলোচিত হয় নি যাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিকাশের কোন স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর বিকাশ ও অগ্রগতি কোন রূপরেখা নির্ণয় করে চলবে, মোট কথা, পার্টি-নেতৃত্বের দ্বারা সাংস্কৃতিক ফ্র্যাকশন গঠন করা সম্ভব হয় নি, যার ফল ও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সংঘের বুলেটিনে সংঘ-সম্পাদক সাজ্জাদ

ভাইয়ের প্রতিবেদনটি মনে রেখে ধনঞ্জয় দাশ প্রসঙ্গত যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য: '...পার্টি কংগ্রেসে আগত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই সময় বোম্বাইতে উপস্থিত থেকেও প্রগতি লেখক এবং গণনাট্য সংঘ-র সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেও পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সুদীর্ঘ অধিবেশন চলাকালে তাঁদের কেউ-ই কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে কোনো আলোচনা করলেন না কিংবা সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট পরিচালনার জন্য কোনো নির্দেশক প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না। এর ফলে, ১৯৪৩থেকে ১৯৪৭সালের মধ্যে সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্রমশ নিষ্ক্রিয়তার অনিবার্য পথেই পা বাড়ালেন।'[১৭৬]

প্রগতি আন্দোলনের নিহিত দুর্বলতার বীজ এখানে উপ্ত হয়েছিল যার, তা মহীরুহে পরিণত হতে আরও কয়েকটি খ্রীষ্টাব্দ সময় নিয়েছিল---আর সেইজন্যেই এই পর্বকে অবরোহণ আখ্যা দিয়েছি আমরা। কারণ, এরপর নতুন উদ্যোগ যদি কিছু শুরু হয়ে থাকে তা খানিকটা তেভাগা আন্দোলনের কৃষকসংগ্রামে ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই এই শিরোনাম সংগত বিবেচনা করি। অবশ্য, এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই পর্বে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভাটা পড়ে নি, বরং তা ঐতিহ্যানুসরণের ভেতর দিয়ে যথোচিত বেগ ধারণ করে রয়েছে।

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় রাজ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, ১৫-১৭ তারিখ জানুয়ারী, ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দ। 'জনযুদ্ধে'র প্রতিবেদক গত দুই বছরের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন---'গত ২বছরের কাজের মধ্য দিয়া ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে দেশের জনগণের যোগ আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই পথে বহু বাধা আসিয়াছে, সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতায় সঙ্ঘের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে।'[১৭৭] আমাদের কাছে দুটি বাক্যই অত্যন্ত মূল্যবান সংকেত। একদিকে আছে প্রত্যাশঙ্কিত স্বীকারোক্তি, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাজনিত পতনসংবাদ। ফ্যাসিবিরোধী রচনা-সংকলন, 'পরিচয়'-এ সম্পাদক স্বয়ং প্রশ্ন তুলেছেন, 'প্রথম সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটি কি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল ?'[১৭৮] এসব বিভিন্ন লক্ষণ, বিভিন্ন সংশয় ও প্রশ্ন থেকে অনুমান করা চলে যে, এই পর্বে উজ্জীবনের আশাকে নতুন করে লালনের জন্যে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এই আন্দোলন থেকে ইতিপূর্বে সরে গেছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখক---জাতীয় সংকটের চূড়ান্ত সময়ে।

এবারে সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমদ, গোপাল হালদার প্রমুখ এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুগ্ম সম্পাদক

হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ও গোলাম কুদ্দুস।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন হিরণকুমার সান্যাল। প্রস্তাবটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করা হলঃ

'গত এক বছরের বিপর্যয়ে বাংলাদেশের কোটী কোটী মানুষের জীবনে গভীর দুর্যোগ আসিয়াছে। বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পিগণ এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য হাতিয়ার তৈয়ারীর কাজে লাগিয়াছেন এবং জনসাধারণের হাতে এখানে সেখানে কিছু অস্ত্রও তুলিয়া দিয়াছেন। যদিও এই সম্মেলন মনে করে যে এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আবেগ আছে, তবে আরো বেশী চেতনা ও সঙ্গতি থাকিলে এই নিষ্ঠা ও আবেগ সার্থক হইবে। কারণ জনসাধারণের মধ্যে যে হতাশা বার বার ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহার প্রভাব লেখক ও শিল্পীদের মনেও পড়িতেছে, এই সম্মেলন ইহাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, কারণ সম্মেলনের অভিমত এই যে, সঙ্কটের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয়ের বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে মহামারী এবং মহামারীর কবলের মধ্যে বৃহত্তর মন্বন্তর জন্ম নিতেছে।...

'ভারতের পূর্ব সীমান্তে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শেষ ঠিকাদার ফ্যাসিস্টরা ও বিকৃত বাংলার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া শব করিবার জন্য নির্বিচারে বোমা ফেলিতেছে। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্র সাম্রাজ্য রক্ষায় রাখার রঙীন স্বপ্নে ঢুলিতেছে, দেশের নেতাদের কারাগারে আটক রাখিয়া অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই অচল অবস্থার সুযোগে মুষ্টিমেয় লোভী ব্যবসাদার দেশবাসীর মৃতদেহের উপর লাভের কড়ি জমাইতেছে, আর ইহার সুযোগে দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভ্রান্ত চিন্তা ও নৈরাশ্য ছড়াইয়া দেশকে গভীরতর সঙ্কটে টানিয়া নিতে চেষ্টা করিতেছে। আর এই ঘোর দুর্দিনে আজও আমাদের দেশবাসী বিভক্ত, দেশের মধ্যে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে এখনও বিরাট ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে দেশের আশাভাজন নেতৃবৃন্দের হাতে দেশকে সমগ্রভাবে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা আসে নাই।...

'...সাধারণ মানবতাবোধও আজ সঙ্কটাপন্ন। এই সম্মেলন লক্ষ্য করিয়াছে যে, দেশের জনগণের মনে যে-শিল্পীরা এই নিদারুণ লড়াইয়ের মধ্যে আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহারা একে একে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে; গ্রামের গায়ক, নট, পটুয়া ও কারুশিল্পীরা হয় গৃহত্যাগী, না হয় মৃত্যুপথে। অতএব বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এখন সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। লেখক ও শিল্পীরা আজ সম্পূর্ণ সচেতন হউন, সমস্ত অসঙ্গতি দূর করুন, নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য গড়িয়া দেশকে নবজীবনের, মানবতার, স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া চলুন।'[১৭৯]...

মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক প্রস্তাবও নেওয়া হয় যার উত্থাপক রণেশ দাশগুপ্ত ও সমর্থক সুশান্ত পাঠক।

এতে বলা হয়ঃ

'আমরা মনে করি যে, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু কতগুলি গুরুগম্ভীর প্রস্তাব পাশ করিলেই চলিবে না। এগুলিকে কার্যক্ষেত্রে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্য চাই আমাদের সংগঠন। আজ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, প্রতিভাশালী লেখক ও শিল্পিগণ উজ্জ্বল আদর্শের দীপ্তিপ্রদীপ সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সঙ্ঘ সফলতার পথে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিভিন্ন জেলার সহিত সঙ্ঘের ভালো রকম যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। ইহার মূলে আছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। সেই জন্য সঙ্ঘকে সজীব ও প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তাব করা যাইতেছেঃ--

১। একটি ভ্রাম্যমান 'কালচারাল স্কোয়াড' থাকিবে এবং সেই স্কোয়াড মধ্যে মধ্যে জেলাগুলিতে যাইয়া জেলার স্কোয়াডগুলিকে নির্দেশ দিবে।

২। জনসংগীত এবং গণসংস্কৃতিমূলক লেখাগুলিকে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

৩। জেলাসঙ্ঘকে দুষ্প্রাপ্য বই ধার দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার গঠন করিতে হইবে। সেই পাঠাগার শাখাসমূহ হইতে উপযুক্ত জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই ধার দিবে।

৪। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীবৃন্দকে সংস্কৃতির গতি এবং ধারার সহিত ওয়াকেবহাল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও শিল্পীদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় 'কালচারাল ব্যুরো' গঠিত হইবেঃ-
(১) গোপাল হালদার, (২) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, (৪) বিষ্ণু দে, (৫) সুশীল বসু, (৬) বিনয় রায় (৭) মণি রায়, (৮) নীরেন রায়, (৯) চিন্মোহন সেহানবীশ (আহ্বায়ক)

৫। বর্তমান অবস্থায় সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে একটি সাময়িক পত্রিকা বা P.E.N যেমন বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন সেরূপ বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত প্রগতিশীল রচনার সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি অনুবাদ-বিভাগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।'[১৬০]

'অন্যান্য প্রস্তাব' উত্থাপন করেন নীহার সরকার ও সমর্থন করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। 'অন্যান্য প্রস্তাবে'র বিষয় হল, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, বেতার- প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলির মালিকাধিকারিগণ দেশ ও মানবসমাজের প্রতি যেন তাঁদের কর্তব্য পালন করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সংঘকর্মী অজিত ঘোষ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নট), কবি মানকুমারী বসু, কবি অজয় ভট্টাচার্য, মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পালের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় দিন অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।

১৫ জানুয়ারী, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

ভাষণে বলেন, 'আমরা মানব জাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তারই বিরুদ্ধে। ... সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশবাসীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব।' যুক্তপ্রদেশ লেখক সঙ্ঘের শিবদান সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যুক্ত সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক' হবে) বিষ্ণু দে, বঙ্গীয় কৃষকসভার আবদুল্লা রসুল সম্মেলনকে অভিনন্দিত করেন। সংঘের বিদায়ী সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ (?)[১৮১] গত বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অবন্তী সান্যাল ও রেবালা বিশ্বাস স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মূল সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, 'অন্য সাহিত্য সভাগুলি হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যিকরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন, তাহাদের কি কর্তব্য আছে, কি তাহারা দিতে পারে তাহাই জানিয়া যান।'[১৮২] সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আবুল মনসুর আহমদ। ভাষণটি সুদীর্ঘ হলেও এতে তাঁর চিন্তাধারার স্বচ্ছতা আবেগের থেকে অনেকখানি যুক্তির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন সুরা ও রুকু (বিশেষ করে ৪৯ সুরা, ১৩নং রুকু; ৪৯ সুরা, ১নং রুকু; ৯ সুরা, ১২ নং রুকু) বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, ফ্যাসিজম কখনই মুসলমান ধর্মাদর্শ হতে পারে না, এটা সম্পূর্ণত ইসলামধর্মবিরোধী। বলেন, 'ফ্যাসিজমের রাষ্ট্রীয় মতবাদ, কি আধ্যাত্মিক মতবাদ, কোনোটাই মুসলমান বরদাস্ত করতে পারে না। ইসলাম ও ফ্যাসিজম এক জায়গায় থাকতে পারে না। মুসলমানের ধর্মমত, তার জীবনাদর্শ, তার সমাজ-ব্যবস্থা, তার শাসনতন্ত্র, কোনোটার সঙ্গেই ফ্যাসিজমের আপোষ হতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'তাই মুসলিম সাহিত্যসেবী ও শিল্পী যারা 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে' যোগ দিয়েছেন, তাঁরা বাঙলার মুসলিম জনমতের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করছেন।' প্রসঙ্গত কয়েকটি পরামর্শও তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্দেশে নিবেদন করেন: 'রাজনৈতিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করাই কি আমাদের কাজ? সভা করে প্রস্তাব পাস করাই কি এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য? তা নয়। রাজনৈতিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করা সাহিত্যিকের কাজ নয়, আধ্যাত্মিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করাই সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাজ। অর্থাৎ সচেতন, অচেতন ও অবচেতন গণ-আকাঙ্ক্ষাকে সজীব ও রূপায়িত করাই সাহিত্যিক শিল্পীর দায়িত্ব।' এইসব পরামর্শের সঙ্গে আরও এক গুরুতর পরামর্শ যুক্ত হয়েছে: 'ভারতবর্ষীয় মুক্তিপথের সমস্যা, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই ভারতের জাতীয় মুক্তির পথ আগলে বসে আছে। এর সমাধান সাহিত্যিক ও শিল্পীকেই দিতে হবে। ... বিশাল ভারতের সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে এই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সাহিত্যিকদেরকেই। শুধু এখানেই সাহিত্যিকদের দায়িত্ব শেষ হবে না। তথাকথিত হিন্দুস্থান যাতে হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত না হয়, আর তথাকথিত পাকিস্তান যাতে মোল্লাতন্ত্রে পর্যবসিত

না হয় এবং সমাজতন্ত্রী হিন্দুস্থান ও সমাজতন্ত্রী পাকিস্তান যাতে গণমুক্তির সমবেত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়, তার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক পটভূমিও ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই আগে থেকে তৈরী করে রাখতে হবে। রুশ গণমুক্তি-আন্দোলনে রুশীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যে-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, ভারতের গণমুক্তি-সংগ্রামেও ভারতের সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরকে সেই ভূমিকাই অভিনয় করতে হবে।'[১৮৩]

সংস্কৃতি-উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজনও ছিল এখানে। ১৬, ১, ১৯৪৪ ট্রিস্টাকে ব্র্যাবন্স পার্কে ছয়-সাত হাজার লোকের সামনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সংগীতে ছিলেন হরিপদ কুশারী। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিল্পীর দল একবার অনুষ্ঠান শুরু করেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'বাঁধন চালাই আমরা কোদাল চালাই' গানটি পরিবেশন করেন। নির্মল চৌধুরী চা-কুলীর গান গেয়ে আনন্দ দেন। চা-বাগানের কর্মী সুধাংশু ঘোষের লেখা চা-কুলীর রমণী চরিত্রে চমৎকার নৃত্যাভিনয় হয়। রংপুরের দল গান ও রেবা রায়ের পরিচালনায় 'মহাবুভুক্ষারনৃত্য' পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি প্রশংসনীয় হয়। কলকাতার দল পোর্ট মজুর রাজকুমার সিংহের লেখা একটি গান করেন। পাঞ্জাব প্রত্যাগত প্রচারকদল 'ম্যয় ভুখা হুঁ' নৃত্যনাট্য অভিনয় করে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে। 'বুভুক্ষু কৃষাণী'র ভূমিকায় তৃপ্তি ভাদুড়ীর অভিনয় দর্শকধন্য হয়। লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে দু পয়সা, এক পয়সা, এমন কি আধলা পয়সাও সাহায্য আসে। মোট ৬৬৯৭।। পয়সা ওঠে। রবিবার বিকেলে ছিল সাধারণ অধিবেশন। আবুল মনসুর আহমদের উপস্থাপিত অভিভাষণটি এইদিন পঠিত হয়। সভায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও ছিলেন। সোভিয়েত, চীন ও অন্যান্য দেশের নির্যাতিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের অভিনন্দন জানিয়ে এইদিন তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও সমর্থন করে বক্তৃতা দেন চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয়কুমার বসু। বীরেন্দ্রনাথ রায়ও বিষয়টি সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। সোমবার ছিল সংস্কৃতি অনুষ্ঠান --- মিনার্ভা থিয়েটার হলে। দর্শকসমাগম প্রত্যাশারও বেশি। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিল্পীদল এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মালদহের গম্ভীরাগান গেয়ে সতীশ মন্ডল প্রচুর প্রশংসা পান। অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। অভিনয়ে ছিলেন গঙ্গাপদ বসু, বিজন ভট্টাচার্য, একটি অপ্রধান চরিত্রে সুধী প্রধান, ছিলেন তৃপ্তি মিত্র, অনু দাশগুপ্ত আর সাত বছরের মণিকা ভট্টাচার্য।[১৮৪]

এই পর্বে দেশীয় পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি, বরং হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়েই চলছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ক্রমাগত হিংসাত্মক ও সংঘর্ষপূর্ণ ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা চালিত আন্দোলন বলে প্রচার চালাচ্ছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক একে কংগ্রেসের গৌরবময় বিপ্লব বলে অভিহিত করছিল। সরোজিনী নাইডু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা

হিসেবে একটি বিবৃতিতে বলতে বাধ্য হন, 'গান্ধীজী বা ওয়ার্কিং কমিটির কেহ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রকাশ্যে বা ইশারায় কোন রকমভাবেই হিংসাত্মক কাজের পরামর্শ দেয় নাই।' তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস সাবোটাজের পরিকল্পনা করে নাই, কংগ্রেস বিদ্রোহ দ্বারা সরকারকে উৎখাত করার কথাও বলে নাই।' 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' গান্ধীজীর এই মূলমন্ত্রের অর্থ জানতে চাইলে সরোজিনী নাইডু বলেন, 'ইহার অর্থ অহিংসভাবে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া, জাপানী আক্রমণকারীকে সাহায্য করা নয়, সম্মিলিত জাতিবর্গকে যাহাতে সাহায্য করা যায় তাহাই লক্ষ্য।' একবার গুজব উঠেছিল, সুভাষচন্দ্র বসু জাপসরকারের কাছ থেকে বাংলার দুর্ভিক্ষে চাল পাঠাতে চেয়েছেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও দাবি করেন--রেঙ্গুনের মাধ্যমে জাপ-অধিকৃত বর্মা থেকে চাল আনাবার জন্যে। মিসেস নাইডু এ প্রসঙ্গে পত্রিকায় জানায় বলেন, 'বাংলার দুর্ভিক্ষে এমন কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে বিদেশের যেই সাহায্য করিতে আসুক সেই বরণীয়। জনসাধারণের এরূপ মনোভাব বিপজ্জনক। আমরা এরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়িব।'[১৮৫]

এদিকে বাংলায় দেখা দেয় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী ২৭ জানুয়ারী, ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের খাদ্য ক্রয়নীতির ব্যাখ্যা করেন। এতে বলা হয়, ধান-চালের ব্যাপারে বাজারের স্বাধীন প্রতিযোগিতা বন্ধ না করে সরকার প্রয়োজনীয় চাল সংগ্রহ করবে। ফেব্রুয়ারীতে বাংলার পিপলস রিলিফ কমিটির কাছে উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠানের থেকে সংগৃহীত অর্থ দান করা হয়। ভারতীয় জননাট্য সংঘের উদ্যোগে বোম্বেতে মধ্যশ্রেণীর ঐতিহাসিক পারেল ময়দানে দুই দিন এই অনুষ্ঠান হয়। জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ বোম্বের জননাট্যসংঘ ও প্রগতিশীল লেখক সংঘ উদয়শঙ্করের দলকে অভ্যর্থনা জানান। এখানে উদয়শঙ্কর বলেন, 'প্রত্যেকের নিজ নিজ একটা সুর থাকে, আমারও তেমনি আছে। আমার সুর হ'লঃ জনগণের মধ্য থেকে তাদের জীবন ও জীবনের নড়াইকে নৃত্যে রূপায়িত করা---এই আমার মহাসুর। আমাদের শিল্পীদের উচিত দেশবাসীর সঙ্গে দেশের জীবন ও সংকটের সাহচর্য করা।'[১৮৬] ২০ জানুয়ারী, ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দে 'জননাট্য সংঘের উদ্দেশে প্রেরিত এক বাণীতে সরোজিনী নাইডু এই আশা প্রকাশ করেন যে, 'থিয়েটারের মধ্য দিয়া জাতির মানস জগত ও বিবেক বুদ্ধিকে সাড়া ও উৎসাহ দিবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা ভারতীয় জননাট্য সংঘ আরম্ভ করিয়াছে আশা করি তাহা সফল হইবে।'[১৮৭]

মার্চ, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির পক্ষ থেকে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীদের কাছে ঐক্যের আবেদন জানানো হয়। ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল অবধি (১৯৪৪) 'জাতীয় সপ্তাহ'-এ জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার আহ্বান জানানো হয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বন্দীমুক্তি, মেডিক্যাল রিলিফ, গ্রাম সংগঠন, ফসলবৃদ্ধি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব ইত্যাদি বিষয়সূচী। 'জনযুদ্ধে'র বিশেষ মে-দিবস সংখ্যায় এই সময় 'নূতন সাহিত্যের ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানের দুঃসহ পটভূমিতে নূতন সাহিত্যের ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে লেখেনঃ 'নূতন জীবনভাবনার সঙ্গে নূতনভাবে ভাবিত সাহিত্যের ভূমিকা রচিত হতে আরম্ভ করেছে। বহু বেদনা, বহু শোকাবহ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই সাহিত্য বহুক্ষেত্রে আমাদের একালের বিশ্বাসের উপর নিষ্ঠুর আঘাত করবে, একালের সংস্কারের যে আশ্বাস আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে সাহিত্যের রূঢ় বাস্তব তার বিরোধী হ'য়ে প্রথম প্রথম আমাদের বেদনার কারণও হবে, কিন্তু তবু তাকে মানুষের গ্রহণ না ক'রে উপায় নেই। মানুষ আজ সকল দুঃখ, সকল অস্বাচ্ছন্দ্য, সকল অকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সকল অক্ষমতা, সকল মিথ্যার হাত থেকেও মুক্তি চায়, সাহিত্যের সেই বাণী সেই মুক্তির বাণী।'[১৬৮]

'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগে ২১-২৩ এপ্রিল, ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় একটি সম্মেলন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কংগ্রেসের জে. সি. গুপ্ত, মুসলিম লীগের আবুল হাশেম, বাংলা ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বাংলার কৃষকের, গ্রাম্যসমাজের দুর্দশা দেখতে গিয়ে, বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কিভাবে সোভিয়েত আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন, সে সম্পর্কে কিছু বলেন। আবুলহাশেম বলেন যে তিনি মার্কসবাদী নন, খাঁটি ইসলামী। ইসলাম তাঁকে শিখিয়েছে যা কিছু সুন্দর ও পবিত্র তাকে ভালবাসতে---সোভিয়েত সুন্দর, তাই তিনি তার বন্ধু। অনুষ্ঠানে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী যামিনী রায়। এই সম্মেলন উপলক্ষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এতে স্বাক্ষর দিয়েছেন---জে. সি. গুপ্ত, বেগম সেনগুপ্তা, লীগসভাপতি নুরুল আমিন ও আবুল হাশেম, মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে স্বাক্ষর দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সজনী দাস। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন--যামিনী রায়, অতীন্দ্রকুমার সেন, গায়কদের মধ্যে--শচীন দেববর্মণ, তারাপদ চক্রবর্তী, সিনেমাশিল্প থেকে--প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, যমুনা দেবী, নাট্যশালা থেকে--নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, খেলার জগৎ থেকে--গোষ্ঠ পাল, বলাই চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ দত্ত, জে. কে. শীল, এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন কৃষকসভা, ছাত্রফেডারেশনের নেতৃবর্গও এতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। ইস্তাহারের অংশবিশেষঃ

'সোভিয়েট ভূমিতে আজ গৌরবের রক্তরেখা জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে, আর লালফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বদেশে জনগণের মনে আশা ও উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাইবেরিয়ান ও তাজিকরা ফ্যাসিবাদের যুদ্ধে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে, যেখানে কাজাক যোদ্ধারা তাদেরই নিজস্ব সোভিয়েট মস্কোকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে অমর হয়ে থাকে, সেই সোভিয়েটের বহুজাতির বিরাট ঐক্যকে

আমরা অভিনন্দিত করি, আর প্রায় তিন বৎসর পূর্বেকার মত আবার আমরা সোভিয়েটকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সৌহার্দ্য প্রেরণ করি।'[১৮৩]

৩-৪ জুন, ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে শহরে 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন 'বোম্বাই ক্রনিকল'-এর সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শতাধিক প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১০০-এর বেশি হয়েছিল। সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে। সরকারী নিষেধাজ্ঞার জন্যে সরোজিনী নাইডু এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকেও বক্তৃতা দিতে পারেন নি। এই সম্মেলনে বাণী পাঠান কংগ্রেসের পক্ষে ভুলাভাই দেশাই, রাজা গোপালাচারি, শ্রী প্রকাশ, সম্পূর্ণানন্দ, ডক্টর মিসেস সুব্বারায়ন, গোপাল রেড্ডি, গোপীনাথ শ্রীবাস্তব প্রমুখ। লীগ নেতাদের পক্ষে নিখিল ভারত লীগ কাউন্সিলের সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান ও ঐ কাউন্সিলের সভ্য ডাক্তার ঈমাম, বাংলার চৌধুরী মুয়াজ্জম হোসেন (লাল মিঞা) প্রমুখ। লেখকদের পক্ষে কেরল থেকে ভল্লাথোল, বাংলা থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী, মহারাষ্ট্র থেকে মামা ওয়ারেরকার। শিল্পীদের পক্ষে যামিনী রায় ও রবিশঙ্কর রাভেল। বৈজ্ঞানিক হিসেবে স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর এইচ. জে. ভাবা (ব্যাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ), লিবারেল নেতা স্যার মহারাজ সিং। বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, অধ্যাপক কোসাম্বি (পুনা), রাজিউদ্দিন সিদ্দিকি (হায়দ্রাবাদ), অধ্যাপক হাবিব (আলিগড়), অধ্যাপক ডাধর (বোম্বে)। সম্মেলনের দু দিনই কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সমবেত সংগীতের ব্যবস্থা ছিল। সভানেত্রীর অভিভাষণে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন যে, তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে আছে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম। কিন্তু তিনি জানেন যে, ভারত শুধু নিজের জন্যে লড়ছে না, ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বজনের স্বাধীনতাকেই ত্বরান্বিত করবে। তাই সব বিষয়ে সোভিয়েতের পথে চলায় তাঁর সন্দেহ থাকলেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েতের স্বাধীন নরনারীর অপূর্ব বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর কার্যবিবরণী পেশ করা হয়। বক্তৃতা দেন ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা এন. এম. যোশী, 'সিংহল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র প্রতিনিধি জ্যাবলি মেন্ডিস, প্রগতি লেখক সংঘ ও জননাট্য সংঘের প্রতিনিধি খাজা আহমদ আব্বাস, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বি. টি. রণদিভে, অধ্যাপক মিস মানাবতী। এঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'র কাজে দেশভক্তদের সাহায্য করা প্রসঙ্গে। সরোজিনী নাইডু দ্বিতীয় দিন (৪জুন) উপস্থিত ছিলেন, তাঁর উপস্থিতিতে সোভিয়েত ফিল্ম 'যুক্রেনের যুদ্ধ' প্রদর্শিত হয়। বিকেলের অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাবাদি আলোচিত হয়। নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির সভানেত্রী হিসেবে সরোজিনী নাইডুর নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। সহসভাপতির মধ্যে অন্যতম ---কবি ভল্লাথোল, সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক কে. শ্রীনিবাসন। সাধারণ সম্পাদক হন ডাঃ. এম. ডায়েকর। যুগ্ম সম্পাদক---হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মুনাফকর। আর

কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ধনেন্দ্র শাক্তিনাল।[১৯০]

২৫ মে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাবোধি সোসাইটি হলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে নজরুল জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নজরুলের গান ও কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নিপীড়িত মানুষ ও সামাজিক বাস্তবের প্রতি নজরুলের ছিল প্রবল পক্ষপাত।' তারাশঙ্কর বলেন, 'নজরুলই আমাদের জনগণের প্রথম কবি। নজরুলের কাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামেরই গাথা।' মুজিবর রহমান নজরুলকে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বিরাট প্রতিভা বলে অভিহিত করেন। বলেন, 'তাঁর কাব্যেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে।'[১৯১]

১৮ জুন, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে প্রাদেশিক কেন্দ্রে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। সভাপতিত্ব করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন, 'গোর্কি সাহিত্যিকগণের মধ্যে একটা নূতন বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পথপ্রদর্শক যার নাম সমাজমুখীন বাস্তববোধ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করাই গোর্কির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। গোর্কি যখন সোভিয়েট শিল্পী সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিপ্রতিভাকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বিকশিত ও সম্প্রসারণ করিতেছিলেন ঠিক তখনই ফ্যাসিস্ট দালালরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির কণ্টক হিসাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।'[১৯২]

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলায় আবার দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছিল। ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানিয়ে সাতাশ জন ভারতীয় নেতা ও শিল্পপতি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ব্রিটেনের জনগণ ও সম্মিলিত জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি যুক্তবিবৃতি প্রচার করেন। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলেন---মিঃ ফ্রাঙ্ক এান্টনি, ডাঃ আম্বেদকর, জি. ডি. বিড়লা, স্যার সুলতান চিনয়, বি. দাস, ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ এম. আর. জয়াকর, এন. এম যোশী, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ।[১৯৩] প্রসঙ্গত এ পর্বের আরও একটি ঘটনা জরুরি। ১৯ মার্চ, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সমর্থনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৫০০০ লোকের সমাবেশ হয়। এই সভা আহ্বান করেন নাজিমুদ্দিন, শহীদ সুরাবর্দী, মৌলবী আবুল হাসেম প্রমুখ লীগ নেতৃবৃন্দ এবং জে. সি. গুপ্ত, সীতারাম শাকসেরিয়া প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মেয়র আনন্দীলাল পোদ্দার। সভায় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় গান্ধী-জিন্নার আপোষ আলোচনা যে জাতীয় পরাজয় নয় সে কথা বলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়---'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে গান্ধী-জিন্নার এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়া ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়িয়া উঠুক এবং আমরা জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হই, ইহাই প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কাম্য।'[১৯৪] গান্ধী-জিন্না আলোচনা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পি. সি. যোশী একে জাতীয় দুর্ঘটনা

হিসেবে অভিহিত করেন। তথাপি তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা সকলের নিকট আবেদন করিতেছি, যে সব বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে সে বিষয়ে সবাই যেন আরও গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিতে এই মতভেদ দূরের চেষ্টা করেন।'[১৭৫]

এই সময় মার্কসবাদীরা তাঁদের আন্দোলনকে বহুবিস্তৃত করে তোলবার জন্যে তাগিদ অনুভব করেছিলেন একটি যথোপযুক্ত প্রকাশনা সংস্থার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী সেই তাগিদের ফসল। এই প্রকাশনার উদ্যোগে ১০-১১ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রাজনৈতিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা প্রগতি আন্দোলনের বিস্তৃতি ও বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজনৈতিক সাহিত্যের প্রাদেশিক সম্মেলন ভারতবর্ষে এই প্রথম। বাংলাদেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রতিনিধি পাঠায়। প্রথম দিন গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক সাহিত্য বিক্রির স্থানীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ বলেন, 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি দুকানা করার প্রতিষ্ঠান নয়, এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার ও সাম্যবাদের বাণী প্রচার করা।' বিকেলের সভায় বক্তব্য রাখেন ভবানী সেন, 'বাংলাদেশে আজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে সেই সংকট হইতে তাহিকে রক্ষার দায়িত্ব আজ লেখক ও পাঠক উভয়েরই।' গণসাহিত্যের উপযোগী ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন সোমনাথ লাহিড়ী। ১১ অক্টোবর (১৯৪৪)-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় তথা শেষ দিনের অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন রঙীন হালদার, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, জয়নুল আবেদীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। সোভিয়েত সাহিত্য সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রুশদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই বিপ্লবী রাজনৈতিক সাহিত্য প্রসার লাভ করিয়াছে। সোভিয়েটের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে রূপক সোভিয়েটের ব্যাপক গণশিক্ষা। ...লেনিন বলিতেন, সত্যিকার কমিউনিস্ট হইতে হইলে যুগে যুগে মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ তাই পুরাতন শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা গ্রন্থের চাহিদা এত বেশী।' গোপাল হালদার বর্ণনা করেন বাংলায় জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় সাহিত্য কি ভাবে বেড়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ প্রগতিশীল সাহিত্যিক জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য বাস্তবমুখী হইতেছেন। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যে রূপদান করিতে হইবে।' ভবানী সেন বলেন, 'এই সম্মেলনকে অনেকে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির বিজ্ঞাপন মনে করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন মনে করিলেও ক্ষতি নাই। ইহা এক অভিনব বিজ্ঞাপন। মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রচারই রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার সংস্কৃতি সংকট দূর করিতে হইলে মার্কসবাদী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার চাই।' সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, 'আজ সাহিত্যিককে প্রাধা

মুসলিম লিগের কাছে ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনের সহিত তাহারা আজ সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতে হইবে। তবেই সাহিত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে।' সভাপতির অভিভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, 'মার্কসবাদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক শোষণনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের জবাব। আজ তাই ন্যাশনাল বুক এজেন্সির রাজনৈতিক সাহিত্য প্রচারের আয়োজন স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়।'[১৯৬]

ইতিহাসের দিক থেকে ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ভূমিকা হল 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার। 'কংগ্রেসনেতা কিরণশঙ্কর রায়-এর অধিনায়কত্বে এবং নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে, গড়ে ওঠে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'।[১৯৭] উদ্দেশ্য ছিল এই সংঘের মাধ্যমে মার্কসবাদের সমালোচনা ও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত ছিলেন সজনীকান্ত দাস, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, বটকৃষ্ণ ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ।-'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব কিছু কৃতিত্ব কংগ্রেসেরই প্রাপ্য---এই মনোভাব এবং উৎকট কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রাণপণে প্রচার করা সত্ত্বেও অবশ্য 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' কিন্তু খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।'[১৯৮] এঁদের পরিবেশিত 'অভ্যুদয়' নৃত্যনাট্যটি খানিকটা জনপ্রিয় হয়েছিল।

৬ জানুয়ারী, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যুতে একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। রোমাঁ রোলাঁ, অনাই বারবুস, প্রগতি-লেখকদের কাছে ছিলেন অনন্য ও অবিচলিতনিষ্ঠ এক আদর্শের প্রতীক। 'জনযুদ্ধ', 'অরণি', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বারংবার রোলাঁর নাম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্মৃতিসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'রয়টারের তারযোগে রোলাঁর মৃত্যুসংবাদ পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। নাৎসীদের অবাঞ্ছা সত্ত্বেও এ দুঃসংবাদের প্রতিবাদ হয় নাই---প্রতিবাদের দুরাশা পোষণ করা কঠিন। রোলাঁর তিরোধান, এই অকরুণ সত্যের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। কিভাবে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে নাৎসী জার্মানীর নৃশংসতা তাঁহাকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাই রোলাঁর এ মৃত্যুতে আমরা শোকের চেয়ে বেশী করিয়া অনুভব করিতেছি গর্ব ও গৌরব। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে ফাসিস্টবাদের ও নাৎসীতন্ত্রের বিরোধী ও সমালোচক রোলাঁর মত এমন আর কেহ ছিল না। এতদিনে সেই কণ্ঠ ও সেই লেখনী চিরতরে রুদ্ধ হইল।'[১৯৯]

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন সম্পর্কে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞপ্তি বিভ্রান্তিপূর্ণ। একটিতে অনুষ্ঠানের তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ , অন্যটিতে ৩ মার্চ, ১৯৪৫। বিজ্ঞাপনের ভাষা উভয়ত্র এক। কাজেই মনে হয়, 'পৌষ' সংখ্যা 'পরিচয়'-এর পর সম্মেলন সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত

হয় ও পরে 'যাব'-সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে তা বিজ্ঞাপিত হয়। সম্মেলনের কার্যসূচীও তাতে উল্লিখিত হয় যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র নামে।[200] এখন প্রশ্ন, সম্মেলনটি কি ৩মার্চ, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ধনঞ্জয় দাশ, সুধাকর চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই ৩মার্চ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন।[201] আমাদের প্রাপ্ত তথ্যসূত্র অন্য রকম। 'জনযুদ্ধ' ও 'পরিচয়'র প্রতিবেদনে পাই ২মার্চ, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দ।[202]

২মার্চ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধনের ভেতর দিয়ে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সূচনা হয়। 'আমার দেশ' শীর্ষক এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে লক্ষ্ণৌয়ের অসিত হালদার মহাশয় বলেন, যে, শিল্পীকেও আজ চাষাদের জীবন থেকে শিল্প-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। প্রদর্শনীতে অতুল বসু, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, জয়নুল আবেদীন সহ ছোট-বড় অসংখ্য শিল্পীর 'আড়াইশ' ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। স্থান পায় মাটির কাজ, ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি শিল্পও। সম্মেলনের মূল মঞ্চটি ছিল মহম্মদ আলী পার্কে। প্রবেশমুখে 'রবীন্দ্রনগর', ভেতরে 'সোমেন চন্দ তোরণ'। সম্মেলন মণ্ডপটি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, গোর্কি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক-শিল্পীর ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ৩মার্চ, ১৯৪৫, শনিবার বিকেল চারটেয় অধিবেশন বসে। সভাপতিমণ্ডলীর নির্দিষ্ট আসনে বসে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, এঁদের পাশে বসেছিলেন লোককবি শেখ গোমানী ও মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য। এই সমাবেশের তাৎপর্য প্রতিবেদক চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষায় ছিল এরকম: ...'বাংলার মধ্যশ্রেণীর সংস্কৃতি আর গ্রামের লোক-সংস্কৃতি---সচেতনভাবে এদু'য়ের মিলন ঘটানোর চেষ্টা অন্তত এদিক দিয়ে বোধ করি এই প্রথম।' তারাশঙ্কর শেখ গোমানীর প্রশস্তিমূলক পরিচয় তুলে ধরেন সমাবেশে। সভাপতি-মণ্ডলীর পক্ষে ছোট্ট একটি ভাষণ পাঠ করেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ছিল তীক্ষ্ণ এবং যুক্তিপূর্ণ। মূল সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কিভাবে সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করেছেন, কয়লাখনির প্রান্তর-বাসিন্দাদের জীবনের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কান্বিত হয়েছেন---তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দান করেন। আয়ার্ল্যান্ডের বিখ্যাত নাট্যকার সিয়ান ও' কেসী সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। সেটি সভায় পাঠ করে শোনানো হয়: !Isend you an Irish greeting, send it surging through your own drum beat and the sound of Indian bugles blowing .Soon the people of Indian will be solving their own problem as they alone can solve them;with full power in their hadds,firmer resolution in their hearts and a hard but bright path stretching out before to a great future ... A new A sia ,with Indian and China leading,will bring about a civilisation justifying itself to God and man.May that day come

swift for the world's sake.'

পাশাপাশি গণনাট্যসংঘের অনুষ্ঠানও চলতে থাকে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র পরিচালনায়। ৪ মার্চ, রবিবার সকালবেলা সম্মেলন মণ্ডপে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত গানের দল(সারি, জারী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি)অংশ গ্রহণ করে। রংপুরের অন্ধবাদক টগর অধিকারী 'দোতরা' যন্ত্রের সাহায্যে শ্রোতাদের প্রভূত মুগ্ধ ও আনন্দ দান করেন। দুপুর তিনটে থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন। সংঘের নাম পরিবর্তন, রবীন্দ্র সাহায্য ভাণ্ডার, শিশুসাহিত্য, সিনেমা-থিয়েটার-রেডিও প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সংশোধনের পর সেসব গৃহীতও হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মকসুদ থেকে আগত (জলপাইগুড়ি জেলা) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সিলেট থেকে অশোকবিজয় রাহা, বাঁকুড়া থেকে গোপাললাল দে প্রমুখ যা এই সমাবেশে স্মরণীয়। ঐদিন বিকেল পাঁচটায় প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি ভট্টাচার্য(সুরশিল্পী)। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বক্তৃতা দেন নদীয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পঞ্চানন ভট্টাচার্যও। তারাশঙ্কর তাঁর ভাষণে বলেন," '১৩৫১ সাল চলছে, এ বৎসরে মন্বন্তর অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকোপে মহারোগের মত চলেও, আমরা নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেয়েছি, আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছি। জীবনের চারিদিকে সেই নৈরাশ্যজনক মৃত্যু-অন্ধকারময় অবস্থা অবকালো কুয়াশার মত বিদ্যমান। তবুও আমরা আকাশলোকে সূর্যের সন্ধান করবার মত আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছি। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভূত হ'চ্ছে।

এই নবচেতনার মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্য-শিল্প এবং সংস্কৃতির মূল্যের উপর অনেক অধিকতর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তাকে রসিকজনের রসাস্বাদনের সাধনস্পৃহা অথবা মনোরঞ্জন থেকে সর্বজনের দৈনন্দিন প্রাণোচ্ছ্বাসের পরম প্রয়োজনীয় শক্তিরূপ হিসাবে স্বীকার ক'রে জীবনের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ব্যাপকভাবে প্রসারণ এবং প্রতিষ্ঠার আয়োজন হ'চ্ছে।'... তিনি বলেন,'আজ সাহিত্যের শক্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদের অর্থ আজ সুস্পষ্ট। সুতরাং যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের দাবী অবশ্যম্ভাবী। এ দাবী যদি বাংলার মুক্তিধর্মী সাহিত্য পূর্ণ করতে না পারে, তবে মানতেই হবে যে বাংলার মুক্তিধর্মী সাহিত্য প্রগতির পথে এই বিংশ শতাব্দীতেও পঙ্গুর পাড়ী চলেছে। একথাও চিন্তাশীলেরা

বলতে পারেন যে মজুর পার্টির জন্য মেঠো পথ, প্রগতির প্রশস্ত পথে চলার দাবী পর্যন্ত তার নাই।'[২০৩] সম্মেলনে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তনের পেছনে বেশ কয়েকটি যুক্তি দেখানো হয়েছে---'বাংলাদেশের সঙ্ঘের নাম এতদিন ছিল 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। এটি 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'ও 'নিখিল ভারত গণনাট্য সঙ্ঘ' উভয়েরই বাংলা শাখা। কেন্দ্র ও শাখার মধ্যে নামের এই বৈষম্যের কারণ এই যে, ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশে জাপানী আক্রমণ প্রায় আসন্ন হয়ে ওঠে ও দেশী ফ্যাসিস্টদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হন তখন সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলার শাখার উদ্ভব হয়। সঙ্ঘের 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী' আখ্যার যুক্তিযুক্ততা ছিল সেইখানেই। তখনও দু'টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটিও ছিল না তাই কেন্দ্র ও শাখার মধ্যে নামের সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্নও ওঠে নি। ১৯৪৩-এর মে মাসে যখন বোম্বাই-এ ঐ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উদ্ভব হয় তখন বাংলাদেশের সঙ্ঘ উভয় ধরনের কাজই চালাচ্ছিল বলে তাকে নিজ নাম বজায় রেখেই উভয় প্রতিষ্ঠানেরই শাখা হিসাবে অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মতবাদে অবিচলিত থেকেও সঙ্ঘের নাম পরিবর্তনের। কিছুদিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও নাম পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই সমস্ত আলোচনা করে তাই এবারকার সম্মেলন কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঙ্ঘের নূতন নামকরণ করল 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।' সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় কবির লড়াই--মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানী আর চট্টগ্রামের রমেশ শীলের মধ্যে। এরপর আরও তিনদিন ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক গণনাট্যসংঘ 'নবান্ন' অভিনয় ও কেন্দ্রীয় গণনাট্য দলে 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যানুষ্ঠান চলে। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এই সম্মেলনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখ। সম্মেলনে পরের বছরের জন্যে নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।[২০৪]

১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের তুমুল আবর্ত একটি সুনির্দিষ্ট পথরেখায় বাহিত হয়, যুদ্ধক্লান্ত সারা পৃথিবী ২৩ এপ্রিল লালফৌজের বার্লিন প্রবেশে সম্ভবত মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। ৩০এপ্রিল বেতার ও সংবাদ-পত্রযোগে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যার খবর কৌতূহলের সঙ্গে শোনে। ২মে(১৯৪৫), বার্লিনের পতন ঘটে লালফৌজের হাতে। সেইদিনই অবশ্য তারা আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে নি, করেছিল ৮মে তারিখে(১৯৪৫), মার্শাল জুকোভের সদর দপ্তরে মার্শাল কাইটেল জার্মানির আত্মসমর্পণদলিলে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মিত্রশক্তিশিবিরে তথা ফ্যাসিবিরোধী শিবিরে ২ মে-র পরেই গভীর উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। ৪মে, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির ডাকে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের সুবৃহৎ মিছিল

বাহিনীর পতনে উল্লাসে অভিনন্দনে ফেটে পড়ে। প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা এই মিছিলে যোগ দেন। বড় বড় পোস্টার ও ফেস্টুনে লালফৌজকে অভিনন্দন, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দাবি জানিয়ে মিছিল কলকাতা পরিক্রমা করে। তার আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সারা ভারত কিষাণসভার সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পতাকা উত্তোলিত হয়। মিছিলের সামনে লালপতাকা হাতে ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, মুজফ্ফর আহমদ, রেজ্জাক খান, নীরেন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য নেতারা। তাঁদের সামনে একদল সাইকেল আরোহী, পিছনে প্রায় পাঁচশত মহিলা। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন ও ছাত্ররাও এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য হল কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রতীক হিসেবে লীগ নেতা লাল মিঞা ও কংগ্রেস নেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর এই মিছিলে বিশেষ অংশ গ্রহণ।

৯মে, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত বিজয় দিবস পালনের পরেও বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে নি। জাপান আত্ম-সমর্পণের সম্মতি জ্ঞাপন করে ১৪আগস্ট, ১৯৪৫-এ। এর মাঝখানে ঘটে গেছে মর্মান্তিক ঘটনা। ৬আগস্ট হিরোশিমায় আর ৯আগস্ট নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত নারকীয় লীলা ছাপিয়ে ওঠে, এমন কি হিটলারের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের' ঘটনার বিভীষিকাকেও তা তুলনায় হার মানায়। ২সেপ্টেম্বর জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার পরেই অবসান ঘোষিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতিতেও নেমে আসে এক ধরনের অস্থিরতা যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে নীতিহীন আদর্শহীন উদগ্র ক্ষমতালিপ্সার চূড়ান্ত পর্বে পা বাড়ায় এদেশের যথার্থ সংকটেই। বিজয়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সুযোগে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী ফৌজ-নায়ক শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলনের প্রকাশ্য বিচার শুরু করবার আয়োজন করে——এর বিরুদ্ধে মুখ্যত ছাত্ররাই আন্দোলনে নেমে পড়ে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই আন্দোলনকে 'কমিউনিস্ট উস্কানি' হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলায় এই বিচার-বিরোধী আন্দোলন রূপ নেয় সরাসরি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে। ২১নভেম্বর, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলন জঙ্গী রূপ নেয়, ২৩নভেম্বর অবধি চলে। এরই সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রতিও বৃদ্ধি পায় অত্যাচার, খুন, সন্ত্রাস, এবং তা শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের দিক থেকে নয়, জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকেও। ১ডিসেম্বর, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে, আক্রমণ পরিচালিত হয়ে ওঠে কবি গোলাম কুদ্দুসের ওপর। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিস থেকে ফেরার পথে লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্রীক রো'র সংযোগস্থলে কয়েকজন গুণ্ডা তাঁকে আক্রমণ করে। অজুহাত——গোলাম কুদ্দুস কমিউনিস্ট। অভিযোগ——কমিউনিস্টরা ৮ডিসেম্বর, শনিবার, দেশপ্রিয় পার্কের আজাদ হিন্দ সম্বর্ধিত সভার শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং একাধিক বিবৃতি দেন কমিউনিস্টদের অভিযুক্ত করে। এসবই নাকি 'জনযুদ্ধওয়ালাদের' কাজ। গোপাল হালদার

'পরিচয়'র প্রতিবেদক হিসেবে [illegible] গুপ্ত, ক্ষোভ আর বেদনার সঙ্গে বলেন যে, দেশের মধ্যে অভাব হয়েছে সত্যের আর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ইতরতার। তিনি বলেন, 'সংস্কৃতি-অনুরাগী হিসাবে আমরা এদিকে বাংলার সংস্কৃতিবানদের মনোভাব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করবার দায়িত্ব বোধ করছি।...
'ঋষি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা নিয়ে যাঁরা অনেকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সংগঠিত করেন---গোলাম কুদ্দুস ছিলেন তারই অন্যতম সম্পাদক, এবং সেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক। যে ইতরতার বেসাতি বাংলা দেশের সামনে খুলে আজ তার এক উপনেতার দল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে সে ইতরতাকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবার দায়িত্ব আজ আমাদের---আমরা যারা কুদ্দুসের সতীর্থ বাংলা লেখক, আমরা যারা ঋষি-রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকেই মানি, জানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অভিযান অন্য দেশে যখন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে এদেশেই তখন তা বাসা খুঁজছে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে।

সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আজ আমাদের আবার ডাক পড়ুক। নতুন করে আমরা শপথ নিচ্ছি প্রত্যেকে---
' I will not rest'.

সেই সৈনিক হিসাবেই আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটি দিকে:
প্রথমত, যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী-চেতনাকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাদে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাতে এ-দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সমান স্বার্থ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেই চক্রান্তে জেনে না-জেনে যোগ দিচ্ছে ইতরতার ব্যবসায়ীরা। সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব---ভারতে বিপ্লব-মুখী জন-চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাদে রেখে তীব্রতর করে তোলা, বিপ্লবকে স্বাগত করা।
দ্বিতীয়ত, এই ইতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পথ হবে কি? এক, দেশের নেতাদের নিকট যথার্থ-সত্য বিবৃত করে তাঁদের শুভ চেতনা প্রবুদ্ধ করা। দুই, দেশের জনশক্তিকে,---মজুরকে, কৃষককে, শিক্ষিত দরিদ্রকে এই ইতরতার বিরুদ্ধে আরও সচেতন, আরও সংগঠিত, আরও সক্রিয় করে তোলা। তিন, জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষক হিসাবে লেখক, শিল্পী বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল সংস্কৃতি-কর্মীকে এই সংগ্রামের সৈনিকরূপে প্রস্তুত করা।
কাজটা সহজ বা বিপদশূন্য নয়। আততায়ীর ছুরিকা সোমেন চন্দকে খুন করেই থামে নি। গোলাম কুদ্দুসকে আঘাত করেও তা থামবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই প্রমাণ করতে হবে---সোমেন চন্দের জাত শুধু লেখে না, মরতেও জানে।'[২০৫]
কিন্তু ঘটনা ঘটছিল আরও একটু দূরপথে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে। কংগ্রেস-নীতির

ঐক্যই এখনো দায়ী। এই অবস্থায় নূতন ও শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলবার জন্যে বারংবার আবেদন জানানো হতে থাকে উভয় দলের কাছে। ভবানী সেন বলেন যে, নতুন বাংলার ভাগ্যরচনা নির্ভর করছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ওপরে। বলেন, 'কংগ্রেস বলিতেছেন তাঁহারা স্বাধীনতা আনিয়া বাংলার ভাগ্য ফিরাইবেন, মুসলিম লীগ বলিতেছেন তাঁহারা পাকিস্তান আনিয়া মুসলমানদের কৃষি ও শিল্প গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু কি করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করিবেন যদি বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান জনগণ একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতা, সুখ ও সম্পদের শত্রুদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, এবং বাংলার সমস্ত সম্পদ নূতন বাংলা গঠনের জন্য সমবেত না করে?' তাঁর মতে, হিন্দু এবং মুসলমানের ভেতর থেকে যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা-ই পরে বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। হিন্দু হয়ে উঠেছে কংগ্রেসভক্ত আর মুসলমান লীগভক্ত। লীগের প্রধানশক্তি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে আর কংগ্রেসের প্রধান শক্তি মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে।' তাঁর বক্তব্য, 'কিন্তু বঙ্গভঙ্গ যেমন কংগ্রেস চায় না, তেমনি লীগও চায় না। উভয়েরই ইচ্ছা বাংলাদেশ একত্র থাকুক। কিন্তু কংগ্রেস চায় বাংলাদেশ হউক অখণ্ড হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, লীগ চায় বাংলাদেশ হউক পাকিস্তানের অন্তর্গত। কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর যদি রফা না হয়, তাহা হইলে মুসলিম বঙ্গ লীগের সঙ্গে যাইবে, হিন্দু বঙ্গ কংগ্রেসের সঙ্গে যাইবে। সকলেরই ইচ্ছা বাংলাদেশ একত্র থাকুক, কিন্তু কংগ্রেস-লীগ সংঘর্ষই বঙ্গভঙ্গের অপ্রিয় সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে। বাংলার এই ভাঙন রোধ করিবে কে?'[206] কমিউনিস্ট পার্টি এ কথা বুঝেছিল, দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ প্রত্যাসন্ন ভাঙনের অনুকূল আবহাওয়া সূচনাকারী। তাহারা প্রথম থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তারা মেনে নিয়েছিল। এর পেছনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা ও যুক্তি কমিউনিস্ট পার্টিকে বেশি করে ভাবিত করেছে। ভবানী সেন প্রসঙ্গত বলেন, 'কংগ্রেস এবং লীগের সংঘর্ষ বাংলার হিন্দু মুসলমানদের বিদ্বেষ বাড়াইয়া জনগণের শত্রুদেরই জয়ী করিয়া তুলিতেছে। অথচ, বাংলার শতকরা ৫৫জন মুসলমানকে বাদ দিয়া কংগ্রেস শুধু জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বলই করিতে পারে, লীগও বাংলার শতকরা ৪২জন হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমানদের শক্তি বাড়াইতে পারে না।

'জনগণের শত্রুদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার পরিবর্তে কংগ্রেস এবং লীগের পরস্পর শক্তি পরীক্ষার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। জনগণের মুক্তি এবং নবজীবনের কথা আপাততঃ তাঁহারা স্থগিত রাখিয়াছেন, তাই দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ভিতরও কংগ্রেস এবং লীগ একত্রভাবে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিল না, গভর্ণরের ৯৩ধারা জয়ী হইল।

কমিউনিস্ট পার্টি এই আত্মঘাতী গৃহবিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাই কংগ্রেসের আক্রমণ পড়িয়াছে কমিউনিস্ট পার্টির উপর। গৃহযুদ্ধ যে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে একথা কোন নেতাই অস্বীকার করেন না,

কিন্তু গৃহযুদ্ধের জন্য দোষ যে অপরের সেই কথাই প্রমাণ করিতে চান। কংগ্রেস এবং লীগ প্রত্যেক পক্ষই বলেন দোষ আমাদের নয় উঁহাদের, গৃহযুদ্ধ ত' হইবেই।

'আজ গৃহযুদ্ধ, কাল মুক্তিযুদ্ধ এই রণধ্বনির সত্যকার অর্থই হইল নিরবচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধ, আমাদের শত্রুরাই শক্তিশালী হইবে। এই নিরবচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধের কোন না কোন পর্যায়ে এক সময় থামিতে হইবে, থামিয়া বলিতে হইবে---আর গৃহযুদ্ধ নয়, এবার মিলিত হই, কিন্তু সে কথা বলিতে যত দেরী হইবে ততই একমত হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এখনও অনায়াসে আমরা একমত হইতে পারি শুধু এই বিষয়ে:

> ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জনগণের নির্বাচিত গণপরিষদের রায় অনুসারে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সমস্যার মীমাংসা করিব, ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আমরা একতাবদ্ধ হইব।

কমিউনিস্ট পার্টি এই আহ্বান লইয়া জনগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।...

'জনগণের ভিতরকার ভেদাভেদ দূর করিয়া বিদেশী শাসন, বিদেশী মূলধন, জমিদার ও মজুতদার---জনগণের এই সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে, ইহাই কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান।'[২০৭]

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, কমিউনিস্টদের এত সমস্ত কার্যকলাপ জনমনেই শুধু নয়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও বিতর্ক সূচিত করেছিল। এ জন্যে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ ওঠে, তাদের জাতীয় কংগ্রেসে থাকতে দেওয়া হবে কিনা। তাদের কার্যকলাপ তদন্তের জন্যে নিযুক্ত হয় একটি সাব-কমিটি। তাদের বিরুদ্ধে গত তিন বছর ধরে (সম্ভবত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের অব্যবহিত পর থেকে) যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেসব খতিয়ে দেখতে এই কমিটিতে নিযুক্ত হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ।[২০৮] কমিউনিস্টদের অবস্থান জাতীয় সংগ্রাম বিরোধী হিসেবে দেখানোর একটা প্রবণতা এ সময় থেকে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু গান্ধীর অবস্থান নির্ণয়ে আমরা কোন্ সিদ্ধান্ত নেব? ৩০ জুলাই, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পি. সি. যোশীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'যখন জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ, তখন যেদিকেই আমি যাই সেদিকে সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং উভয় দিকে যখন বিপদ তখন আমাকে থাকতে হয় মাঝামাঝি জায়গায়।'[২০৯]

বলাই বাহুল্য, 'জনযুদ্ধ'র বিভ্রান্তি সত্ত্বেও গান্ধী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাঁর অবস্থানকে মধ্যপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়েও জাতীয় কংগ্রেসসেবকদের দ্বারা কখনও কলুষিত হন নি। হন নি রাজা গোপালাচারিও, তিনি অগাস্ট-আন্দোলনে নিজেকে জড়ান নি। ম্যাকসওয়েল-যোশীর সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা রটাবার যোগ্য উত্তর 'ওয়াভেল পেপারস'-এ রয়েছে: 'কম্যুনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধোদ্যোগ সমর্থন করে বটে, কিন্তু

তাদের প্রচার আগের মতো এখনো (১৯৪৩-৪৪) ব্রিটিশরাজের বিপক্ষে, আর তারা ক্রমাগত কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তি দাবি করে চলেছে। 'হোম' সেক্রেটারী টটেনহাম ভেবে ছিলেন যে পার্টিকে আবার নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু পরে স্থির করেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের লিখিত অনুযায়ী জোর করেই বলা হচ্ছে যে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির আইনসংগত অস্তিত্ব যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিনের জন্যই, তারপরে আর নয়।'[২১০] অন্যদিকে, ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আজাদহিন্দ বাহিনীর কয়েকজন বন্দী সেনানীর বিচার-উপলক্ষে কলকাতা দিল্লী ও বোম্বেতে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলন দেখেও প্রস্তাব গ্রহণ করেন আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আইনসংগত পথে পরিচালিত করতে। অবশ্যই আজাদহিন্দ বাহিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত বিচারে আসামীদের আইনজীবী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ভুলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহরু, সঙ্গে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু। ছিলেন লীগপক্ষের নেতা মিঃ জিন্নাও।

১২-১৩ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দ। পালিত হয় 'রশীদ আলি দিবস'। ঘটনার উৎস আজাদহিন্দ বাহিনীর প্রতি জাতির উত্তাল আবেগ। আবদুর রশীদ আলি আজাদহিন্দ বাহিনীর ফৌজ, তাঁর মুক্তি দাবি করে চারদিন আবার কলকাতার জনজীবন স্তব্ধ করে মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এই মিছিলে শামিল করা হয় মুসলিম লীগের শহীদ সুহ্‌রাবর্দীকেও। সীতারামাইয়া লিখেছেন যে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কলকাতায় ৪৩ জন নিহত ও ৪০০জন আহত হন।[২১১] নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারীর দিনগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' এবং তারাশংকরের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসে চিত্রিত দলিল হয়ে আছে। এইসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল বোম্বাইয়ে 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভী'র নৌ-বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ। প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮ ফেব্রুয়ারীতে। এ্যাডমিরাল গডফ্রে(ব্রিটিশ)-র চরমপত্রে বিদ্রোহকে বিচূর্ণ করবার হুমকিতে নৌ-বিদ্রোহীদের স্ট্রাইক কমিটি জনগণের কাছে এক আবেদনে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের পক্ষে বল্লভভাই প্যাটেল এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু বোম্বের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধর্মঘটে ও হরতালে শামিল হয়ে বিদ্রোহকে স্বাগত জানায়। ২১থেকে ২৩ফেব্রুয়ারী শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের একাংশ যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলল তাতে ২৫০জনের মৃত্যুর বিনিময়ে স্বাধীনতালাভ ঘটে উঠল না বটে, কিন্তু স্বাধীনতাসংগ্রামের ও জাতীয় উন্মাদনার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। 'দ্য ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি' তাদের সর্বশেষ আবেদনে (২৩ ফেব্রুয়ারী) জানালো-- 'Our strike has been a historic event in the life of our nation. For the first time the blood of men in the services and men in the streets flowed together in a common

cause. We, in the services, will never forget this. We know also that you, our brothers and sisters, will not forget. Long live our great people, Jai Hind !'[২৫২]

নৌ-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর 'হরিজন'র সম্পাদক ১মার্চ, ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদকীয়তে লেখেন: 'ভারতীয় নৌসৈন্যদলের ধর্মঘটের প্রতি শোচনীয় পরিণতির যে সকল সংবাদ বোম্বাই ও করাচী হইতে আসিয়াছে---তাহাতে দেশব্যাপী ক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হইবে। যাহা ছিল ধর্মঘট, যাহা ছিল ন্যায্য অধিকারের দাবী পূরণের চেষ্টা, তাহা বিদ্রোহাত্মক রূপে ফুটিয়া উঠিল। দুর্বলের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী প্রবলের দৃষ্টিতে যখন ক্রুদ্ধের স্পর্ধারূপে বিবেচিত হয়, তখন যাহা ঘটে, এক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। নৌ-সৈন্যদলকে অন্যায়ে বশ্যতা স্বীকার করান ছাড়া কর্তৃপক্ষ আর কোন উপায়ই গ্রহণ করিলেন না, ফলে, ক্ষিপ্ত হইয়া তাহারাও সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অবশেষে যাহাই হউক, এক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর বিপুল শক্তির নিকট তাহারা পরাজিত হইল।'[২৫৩]

অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে, কারণ, বিদ্রোহী নাবিকেরা জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্টদের পতাকা উড়িয়েও তাদের সমর্থন আদায় করতে পারেনি, ব্যতিক্রম কমিউনিস্ট পার্টি। আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দরকার নেই। অরুণা আসফ আলি 'ব্যারিকেড লড়াইয়ের' প্রার্থনা করলে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এ কথা ঠিক যে কমিউনিস্টদের সেরকম বিরাট শক্তি ছিল না যা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এই চরম ও উপযুক্ত সময়ে নেতৃত্ব দিতে তারা সক্ষম। শুধুমাত্র নৈতিক সমর্থন জানিয়ে এর থেকে জয় তুলে নেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। এরপরেই বিমান বাহিনীর ধর্মঘট আর ডাক-তার বিভাগের ধর্মঘট(২৯জুলাই) আবার কলকাতার রাজপথকে রীতিমত আন্দোলিত করে তোলে।

ইত্যাকার আন্দোলন কি গণচেতনার স্বীকৃতি? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা এর একমাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। একে কোনমতেই গণচেতনা বা রাজনৈতিক চেতনাও বলা যায় না। ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবিদার মুসলিম লীগ ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে তাদের প্রস্তাব পাশ করিয়েছিল, আর ১৬অগাস্ট, ১৯৪৬-এ ডাক দিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র। জাতীয় কংগ্রেস মিঃ জিন্নাকে এক চমৎকার চিঠি দিয়ে এর থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল।[২৫৪] আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝে নিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের ঠিক কোন জায়গাটিতে মূল দুর্বলতা। বুঝে নিয়েছিল নৌ ও বিমানবাহিনীর বিদ্রোহে জাতীয় কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের ঔদাসীন্য কেন, কেন সিমলা-আলোচনার ব্যর্থতা, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলির প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশন-এর সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীও একইভাবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় যা সহজেই ব্রিটিশ শাসককে তাদের ভেদনীতি প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে উৎসাহিত

...কতায় সাধারণ মানুষ বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মনুষ্যত্বের এই ... করেছে। ঘটনায় ... জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি আস্থাশীল বুদ্ধিজীবী-লেখকরাও সম্ভবত ধৈর্যচ্যুত হয়ে ... ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি প্রত্যাহার করে নেন। বলেন, 'স্বাধীনতাকামী হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই কলিকাতার ভয়াবহ কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন। কলিকাতার রাস্তায় সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রমাণ করিল যে, মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বৃটিশদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। ......মুসলিম লীগের এই 'সংগ্রামের' সহিত কমিউনিস্ট পার্টির কোন সহানুভূতি নাই।'[255]

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়। পূর্ববাংলার সন্দ্বীপে ২০অক্টোবর, ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিহত হন কমিউনিস্ট কর্মী লালমোহন সেন। 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয়তে গভীর বেদনার সঙ্গে লেখা হয়: 'স্বজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া মুসলমানদের প্রতি পরম বিশ্বাস লইয়া লালমোহন চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।'[256] শহীদ লালমোহনের স্মৃতি তখনকার কবি-সাহিত্যিকদের মনে অভূতপূর্ব সৃষ্টিপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রগতিশীল কবিরা একাধিক কবিতা তাঁকে নিয়ে রচনা করেছেন। দাঙ্গা প্রতিরোধের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায়, বলেছেন, ...'কলকাতায় আমাদের আন্দোলনে গোড়ায় গলদ নিশ্চয়ই ছিল, নইলে '৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট অমন অপ্রস্তুতভাবে কেন আমাদের দেখতে হল তিনদিন ব্যাপী দানবীয় তাণ্ডব, ... কেন ধাপে ধাপে শান্তি মিছিলের করুণ উপস্থিতি ছাড়া প্রবল হস্তক্ষেপের উপায় খুঁজে পাই নি? ...কেন আমাদের চুপ থাকতে হল নোয়াখালির দাঙ্গা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্দান্ত ধরনের কমিউনিস্ট লালমোহন সেনের প্রাণাহুতির উদাহরণ দেখিয়ে---বুর্জোয়াদের মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং যেভাবে দাঙ্গারোধে পরম পরিব্যাপ্ত ভূমিকায় নেমে ছিলেন?'[257] এতো নির্মম সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে সাহিত্যিকদের ইতিকর্তব্যও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, একটি ইস্তাহার প্রকাশের মাধ্যমে। ইস্তাহারের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল:

STATEMENT ON COMMUNAL DISTURBANCES

"A terrible calamity has befallen our people. In the major cities of our country a frenzied violence has broken out, a fraternal strife which is perverting the passions of our people and making our land of love into jungle.

'What are the fundamental causes of the communal outbreak in Calcutta and other cities? Calcutta exhibited all that is most rotten, most diseased, putrefying and reactionary in our social and political life; the appeal to religion in order to divide Indians; to revivalism in order to split the common people; to racialism in order to prove the superiority of one people over another and to perpetuate conflict among them; to communalism in order to consolidate outmoded caste and religious differences — these are the traditional weapons which exploiters use to dominate and enslave the common people. Our arch-enemy British imperialism has sedulously fostered all this in our country for the last two hundred years. While discouraging the growth of commoness and democracy in all its aspects, British imperialism encouraged, fostered and developed feudalism, communalism, and used them as its political allies ..... The Indian freedom movement rose as a challenge to British imperialism both in its political and reactionary cultural aspects. The greatest writers, poets, novelists, artists of modern India, are also ardent champions of Indian unity, Indian freedom, Indian democracy. All that is best and highest in Modern Indian literature is the product of our revolt against the reactionary ideologies fostered by British imperialism and its Indian allies.

'We, the Indian progressive writers, refuse to believe that civil war and fratricide is the inevitable path which our people must follow. Those leaders who today are inciting our people to fight against each other; those who take the help of British imperialism to fight fellow Indians, we indict as anti-national, agents of

profiteering and exploiting interests, who play into hands of Imperialism and thus prolong the period of our slavery.
'We call upon all our friends to turn the tide from fratricidal hatred to the struggle against our British imperialist oppressors.'[২১৮]

এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছেন আটত্রিশ জন বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ।

বাংলাঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উর্দুঃ জোশ মলিহাবাদী, কৃষণ চন্দর, কে. আহমদ আব্বাস, ইসমত চুগতাই, উপেন্দ্রনাথ আশক, সাহীর লুধিয়ানবি, ইব্রাহিম জলিল, আলি সর্দার জাফরি, কাইফি আজমি, হাজরা মাসরুর, সাজ্জাদ জহীর, ইসরাউল হক মাজাজ।

হিন্দীঃ অধ্যাপক পি. সি. গুপ্ত, রামবিলাস শর্মা, অমৃতলাল নাগর, অমৃত রায় (সম্পাদক, 'হংস'), অধ্যাপক শিবদান সিং, নরোত্তম পি. নাগর, পাহাড়ি, যশপাল, রমেশ সিংহ, নরেন্দ্র বাহাদুর সিং, রাজীব সাকসেনা, নেমিচাঁদ।

মারাঠীঃ মামা ওয়ারেরকর, নারাইন কালে।

গুজরাটীঃ গুণবন্ত রাই আচার্য, বকুলেশ, প্রমাদ পারেখ, জেঠালাল গান্ধী, সুন্দরম।

ইংরেজিঃ মুলকরাজ আনন্দ।

আগেই আমরা জানিয়েছি যে, কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্টদের অভিযোগ তদন্তের (প্রকারান্তরে বিতাড়নের) জন্যে গঠিত কমিটি (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)-তে ছিলেন জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও গোবিন্দবল্লভ, তাঁদের সে-কাজ সুসম্পূর্ণ হল ৭-১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে। পূর্ব পরিকল্পিত এই সিদ্ধান্ত। এই খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কমিউনিস্টরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সম্ভবত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এই পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাকেই অনতিবিলম্বে কমিউনিস্টদের বিতাড়নের সিদ্ধান্তটি নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে।

এই ব্যাপক প্রেক্ষাপটে, বিশেষত জঙ্গী গণসংগ্রামের প্রবাহ নিয়ে গড়ে ওঠা যুদ্ধোত্তর অভিযানসমূহ, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সেনাদের মুক্তির দাবি, নৌ ও বিমানবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ধর্মঘটগুলি, ডাক ও তার বিভাগের বিক্ষোভগুলি---সংগ্রামের নিহিত তাৎপর্য নিয়ে দেখে উপস্থিত হল বাংলাদেশের চির-অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে। রক্ষা করার, আজাদহিন্দ বাহিনীর শাহনওয়াজ, ধীলন ও সায়গলকে মুক্তি দেওয়া

হয়েছিল, ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটও নিঃসন্দেহে সফল বলা চলে, কেননা, তাদের অনেকগুলি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছিল। গ্রামবাংলা দুর্ভিক্ষের যে নীরব যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারই বিস্ফোরিত রূপ প্রকাশ পেল তেভাগা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সোচ্চার প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে।

তেভাগা-আন্দোলনের শুরুটা, ভবানী সেন উল্লেখ করেছেন, নভেম্বর, ১৯৪৬,[219] অন্যত্র সুনীল সেন লিখেছেন, বাংলার কৃষক সভা এই ডাক দেয় ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে।[220] দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় 'মাঠের লড়াই' (বিশেষণটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের)-এরা সংগঠিতভাবে শুরু করে এই আন্দোলন। তেভাগার দাবি, সুনীল সেনের মতে, কৃষক সভার এতে কোন নতুনত্ব নেই, কৃতিত্ব নেই, কেননা এই দাবি বস্তুত 'ল্যান্ড রেভেনিউ' অনুমোদিত। 'ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন' এটি ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে বর্গাদারদের পক্ষেই দাবি করে।[221] এই আন্দোলনের কয়েকটি শ্লোগান পর্যালোচনা করা যেতে পারে: 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার কৃষক এক হও', 'নিজ খোলানে ধান তোল', 'আধিয়ারের খোলানে সব ধান', 'জান দেব তবু ধান দেব না', 'আধি নাই, তেভাগা চাই',, 'আধিয়ারের উপর শারীরিক নির্যাতন চলবে না', 'চৌকিদারি ট্যাক্স বাতিল কর', 'চিকিৎসা, নলকূপ, শিক্ষা চাই', 'কর্জ ধানের সুদ নাই', 'বেগার প্রথা বন্ধ কর', 'কৃষকের ঋণ মকুব কর', পতিত জমি ফেরৎ চাই', 'জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', --- সুনীল সেন জানিয়েছেন যে এগুলি খুব সহজ ভাষায় শ্লোগান, কিন্তু বাস্তবে তা নয়, নিরক্ষর, রাজনীতি-পরিচয়হীন, ভুখা মানুষের গলায় এই শ্লোগানগুলির সঙ্গে তাদের যুক্তি-বুদ্ধির যোগ সূত্র জড়িয়ে ছিল না, বিশেষত ক্ষেতমজুরের সঙ্গে এই আন্দোলনের আত্মিক সম্পর্ক ছিল না। লক্ষ্য করবার আরও যে, এই শ্লোগানগুলির মধ্যে কৃষকের মজুরির দাবি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বলতেই হবে, এই দাবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাবিই হল 'আধি নাই, তেভাগা চাই'---উৎপন্ন ফসলের তিনভাগ চাই আধিয়ারের, ফসল উৎপন্নকারীর। বঙ্গীয় কৃষক সভা ১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জমিদারিপ্রথার বিলোপ ও তেভাগার দাবি নিয়ে সাধারণ প্রচারকার্য চালিয়ে আসছিল। এই আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ বাঁধাবার জন্য সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকেরা চাষ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফসল তুলে আধিয়ারদের (কোথাও কোথাও এদের ভাগচাষী অথবা আইনের ভাষায় বর্গাদারও বলা হয়) খোলানে জমা করা শুরু করে। একাধিক অঞ্চলে জোতদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে আপোষ-বৈঠক শুরু হয়, অধিকাংশক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের গ্রেপ্তার অথবা জোতদার-আধিয়ার সংঘর্ষও হয়। ভবানী সেন লিখেছেন, 'জোতদার ও সরকার উভয়েই এ-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিল যে তেভাগার দাবি অপ্রতিরোধ্য। গান্ধীজী প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন দাবিটা ন্যায্য। এমন কি ঊর্ধ্বতন আমলারাও প্রায়শই স্বীকার করত যে তে-ভাগার পক্ষে যুক্তি অনস্বীকার্য।'[222]

ভবানী সেন মনে করেন যে, এর ফলে এই আন্দোলন তার বড়ো 'গ্রাম' পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (জানুয়ারী) লীগ মন্ত্রীসভা আধিয়ারদের জন্য উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জমিতে তার প্রজাস্বত্বের অধিকার বিধিবদ্ধ করে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। প্রাথমিক এই সাফল্যের পর আন্দোলন তার দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল উনিশটি জেলার ষাট হাজার কৃষকের মধ্যে এবং আধিয়ারদের এই আন্দোলনে সমবেত হয় ক্ষেত-মজুর, ভূমিহীন কৃষক, ভূমিদাস, ধাঙড়, মাহিষ্য প্রভৃতি কৃষিজীবী শ্রেণী। আন্দোলনের ওপর একসময় নেমে আসে পুলিশী অত্যাচার। সুস্পষ্ট আবদুল্লা রসুল লিখেছেন, আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্ররূপ পাবে একথা কৃষক কাউন্সিল একসময় ভাবেন নি। প্রশাসনের দিক থেকে অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে পর সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। ২৫-৩১ জানুয়ারী, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পালিত হয় দমননীতিবিরোধী সপ্তাহ। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, তেভাগা আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশজন ও গ্রেপ্তার হন আনুমানিক পাঁচ হাজার কৃষক।[226] তেভাগা আন্দোলনকে কেউ কেউ কৃষকদের গণজাগরণ বলেছেন। এর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষকসভা। বলা দরকার যে, এই আন্দোলন প্রাচীন কায়েমী স্বার্থের সবচেয়ে ধনী-অংশের প্রতি আঘাত করেছিল এই সংগ্রাম, একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক জোতদারির প্রতি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও এক অনিবার্য আঘাতস্বরূপ। তবু এর ব্যর্থতার দিকগুলিও খুব ছোট করে দেখা ঠিক নয়। বদরুদ্দিন উমর এই আন্দোলনের ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির আপোষকামী নেতৃত্বের ওপর।[228] আবদুল্লা রসুল এর কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে: 'এই আন্দোলন যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারে নি তার প্রধান কারণ তার নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণা এবং তার ফলে আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাব।'[225] মধ্যবিত্তশ্রেণীও এই আন্দোলনকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছিল, মনে করেছিল এই আন্দোলন তার স্বার্থ-পরিপন্থী।[226] জলপাইগুড়ি অঞ্চলের তেভাগা-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী চারু মজুমদার এর ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করেছেন তত্ত্বের দিক থেকে 'শোধনবাদী চিন্তাধারা'কে।[229]

অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এই আন্দোলন মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশের সহানুভূতি অর্জন করেছিল, বিশেষ করে প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল খাঁপুর, ঠুবিয়া, রামবাজার, তমলুক, কাকদ্বীপের কৃষকদের, কৃষক রমণীদের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ সংকেতে, জীবন পণ-করা তীব্র উদ্দীপনায়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিস্ফোরিত আত্মপ্রকাশে, আর সর্বহারার স্বপ্নরাজ্য প্রতিষ্ঠার এক গভীর উদ্দাম কামনায়---এগুলি তাঁরা লক্ষ্য না করে পারেন নি। তখনকার সাহিত্যে-শিল্পে কৃষকের সঙ্গে আত্মীয়তা

অর্জনের দুরাকাঙ্ক্ষা এক বিস্তর যে ছাপ রেখেছে তা এই উদ্দীপনা ও আবেগ থেকেই সংগৃহীত।

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম ও প্রগতি আন্দোলনে এক নতুন ধারা সংযোজন করেছে। হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসনাধীন তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষকেরা ওয়ারেঙ্গল, খাম্মাম, নালগোন্ডা ইত্যাদি জেলার প্রায় তিন হাজার গ্রাম থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও তা ছিল সাময়িক। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই আন্দোলনের সূচনা এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে এটি প্রত্যাহৃত হয়। এই বিশেষ অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক যে সমাজ-কাঠামো ছিল, আন্দোলনের ফলে তাতে সংস্কারমূলক কিছু আইন করে স্বীকৃতি পায়। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল অন্ধ্রের তরুণসম্প্রদায় যাদের অধিকাংশই কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ কর্মী। এই আন্দোলন ভূমি থেকে সরাসরি নিজাম-সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতির ফলে এই অঞ্চলে আর্থিক যে অবনতি ঘটে, তেলেঙ্গানার সংগ্রামে লক্ষ করা যায় তারই প্রতিক্রিয়া। ডি. এন. ধনাগারে এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন: 'Economic conditions of the different strata of Telangana peasantry had deteriorated, first due to the depression and later due to the depression and later due to the war. The peasent groaned under the tyranny of landlords, deshmukhs, and sahukars, an unsympathetic police force and an unfair revenue, judicial, administritive machinery that added misery to his proverty...Any organization espousing his cause could have won his gratitude and support. Through the Andhra Conference young communists voiced the peasent's grievences, paid more and more attention to the agrarian problems in Telangana, and mobilized opinion in favour of abolition of landlordism and the oppressive vetti system.'[226]

অন্ধ্রের কমিউনিস্ট পার্টি বৈপ্লবিক এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, মাও সে-তুঙের রচনা ও চিন্তাধারা ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর (বিশেষত ইয়েনান সম্মেলনের পর) এ দেশীয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের সংগ্রামশীল মননচর্চায় প্রভাব অভিঘাত আনে। মাওয়ের রচনা 'থিয়োরি অফ নিউ ডেমোক্রেসি'

-এই আন্দোলনে তাত্ত্বিক মদত জুগিয়েছিল:

...'This,is argued,was in keeping with the Maoist theory of 'new democracy'which propounded a multi-class alliance as the correct strategy for advancing the socialist revolution in colonies and semicolonies.'[229]

তেলেঙ্গানা-আন্দোলন বস্তুত বুর্জোয়া-জমিদারবিরোধী আন্দোলন হলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভূস্বামী বিরোধী' দল হিসেবে সারা ভারতের মানচিত্রে জায়গা করে দিয়েছিল। শাসকশ্রেণী কমিউনিস্ট-পরিচালিত এই আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। এ সম্পর্কে পি. সুন্দরাইয়ার গ্রন্থ 'তেলেঙ্গানা পিপলস আর্মড স্ট্রাগল(১৯৪৬-১৯৫১)-এর ভূমিকায় এম. বাসবপুন্নাইয়া লিখেছেন:

...'the ruling classes have been giving to priority to suppress and disrupt the Indian Communist movement by every means at their disposal.But the Communists,with the backing of the democratic and progressive-minded people of India,have successfully fought back,and established themselves as the leading left force in the country,and as the real hope of the people for a genuine alternative to the bourgeois-landlord class rule in the country.'[230]

এই আন্দোলনে চার হাজারেরও বেশি কমিউনিস্ট কর্মী ও কৃষক নিহত হন, দশ হাজারেরও বেশি কর্মী জেলে যান, পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী বারংবার ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হয়রান করে, নানাভাবে তাদের ওপর অত্যাচার ও পীড়ন চালানো হয়।[231] আন্দোলনকে দাবার জন্যে পুলিশী সংঘর্ষ তো ছিলই, তদুপরি হায়দ্রাবাদের রাজাসরকার ও ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট(ভারত তখন স্বাধীন) পঞ্চাশ হাজার শক্তিশালী বাহিনী নিয়োগ করে চূড়ান্ত দমননীতির আশ্রয় নেন। কিন্তু এটাই সব নয়। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টিতে নতুন রণনীতি ঘোষিত হয়। কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেসে (২৮ফেব্রুয়ারী-৬মার্চ, ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দ) কমিউনিস্ট পার্টি যে সিদ্ধান্ত নেয় তার সারমর্ম হল: সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বুর্জোয়াদের পুঁজিবাদী শোষণের একই সঙ্গে অবসানের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রাম চালানো আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি। একদিকে রণদিভের এই রণনীতি, অন্যদিকে স্ট্যালিনের দ্বারা প্রাণিত অজয় ঘোষের নেতৃত্বের আহ্বানে তেলেঙ্গানার কৃষক বিপ্লব সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও অচিরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও শিল্পী-সাহিত্যিকদের রক্তে সঞ্চার করেছে প্রভূত উৎসাহ, উদ্দীপনা, তেলেঙ্গানা সেদিন

থেকে এক প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁদের কাছে। প্রগতিশীল কবিরা তেলেঙ্গানার কৃষক বিপ্লব থেকে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে আরও নিবিড় করে অনুভব করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

নতুন রণনীতিঃ পার্টি ও সাহিত্যে

...'সাম্রাজ্যবাদের দুর্জনবুদ্ধিকে ছোট করে দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আশু লড়াই-এর কার্যক্রম স্থির করতে অস্বীকার করে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধের পর আপনা-আপনি স্বাধীনতা আসবে এই ধারণা প্রচার আর এবং ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ভার বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়ার(যে) মারাত্মক তোষণবাদী নীতি ১৯৪২-৪৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে চলেছিল' ......

-সুধী প্রধান

'প্রগতি সাহিত্য ও নবনাট্য আন্দোলনের একদিক', সংস্কৃতির প্রগতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮০

আমরা লক্ষ্য করে থাকব যে প্রগতি লেখক সম্মেলন ১৯৪৩থেকে১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দ অবধি মোটামুটি বন্ধ ছিল। ৪৬'-এর দাঙ্গার বিরুদ্ধে একবার বাংলাদেশের ও সর্বভারতীয় লেখক-শিল্পীদের সোচ্চার হতে দেখি। তারপর গণনাট্যের বিভিন্ন কার্যক্রম ছাড়া প্রগতি লেখকদের সক্রিয়তা আবারও চোখে পড়ে না; তার কারণ একাধিক। প্রথমত, সাহিত্য-শিল্প সামাজিকক্ষেত্রে তীব্র অস্থিরতার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না। সংকট কেটে গেলে সংকটের আবর্ত শিল্পীচিত্তে থিতিয়ে এলে তবেই শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা তোড়ালো হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর কৃষকদের দুর্বার তেভাগা আন্দোলনের পরে-পরেই ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দের ১৫ইআগষ্ট ঘোষিত হয় [illegible] ভারতের স্বাধীনতা। একটি রাষ্ট্র থেকে দু-টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান মুক্তির লেশমাত্রকাহিনী চাপা পড়ে গিয়ে আবালবৃদ্ধ নরনারীর মনে 'স্বাধীনতা'র বার্তা যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা আনে তাতে কমিউনিস্টরাও প্রবলভাবে প্রভাবিত হন, অন্তত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণাপ্রসঙ্গে এর সত্যতা অস্বীকার করেন নি।[২৬২] দ্বিতীয়ত হল, ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দের পর প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে তাত্ত্বিক বিতর্ক শুরু হলে আন্দোলন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। সম্ভবত এর আগে কোন এক সময় পার্টির পক্ষ থেকে সুধী প্রধান, বিনয় রায় ও চিন্মোহন সেহানবীশকে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠন করে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এক তাত্ত্বিক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে। আলোচনার বিষয় হলঃ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দের ১৪ইআগষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি (বলশেভিক) সোভিয়েত লেখক জোশচেঙ্কো ও আন্না আখমাতোভাকে অভিযুক্ত করে তাদের সৃষ্ট সাহিত্যে সোভিয়েত সমাজজীবন

ও সোভিয়েত জনগণকে কলুষিত করে চিত্রিত করবার দায়ে অভিযোগ করা হয়ঃ

'The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union(Bolsheviks)places on record that the Leningrad literary journals Zvezda and Leningrad are being conducted in an absolutely unsatisfactory manner.

Together with noteworthy and well-written works by Soviet authors, authors,Zvezda has of late published many articles and stories that carry no message and are ideologically harmful. ...

Zoshchenko has long specialized in vulgur,puerile writings, in the preachment of vulgarity,of the utterly rotten conception that literature is void of purpose or meaning and is apolitical. This was calculated to mislead our youth and poison their minds.The latest of Zoshchenko's stories,The Adventures of a Monkey,(Zvezda,No.5-6,1946)is a vile lampoon of Soviet life and Soviet people.Zoshchenko draws an ugly caricature of Soviet customs and Soviet people whom he slanderously represents as crude,uncultured,stupid,with philistine tastes and manners, and couples his malicious libel on our way of life with anti-Soviet attacks.'[২৬৬]

আন্না আখমাতোভা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়ঃ

'Akhmatova is a typical exponent of the barren and idea-less poetry that is so alien to our people.Her verse,permeated with sentiments of pessimism and despondency,is in line with the tastes prevalent in prerevolutionary drawing-room poetry,which went to further than the decadent aestheticism of the bourgeoisie and the aristocracy --"art for art's sake"--and refuses to march

in step with the people. Akhmatova's poetry is inimical to the education of our young generation and can not be tolerated in Soviet literature.'[২৬৪]

এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের দাবি প্রধানত উত্থাপিত হয় জদানভের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। জদানভের বক্তব্যের সারবত্তা বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ মেনে নিয়েছিলেন বলে ধনঞ্জয় দাশ জানিয়েছেন। জদানভের বক্তব্য হল কেন্দ্রীয় কমিটিরই বক্তব্য, অতএব এর একটা মূল্য স্বীকার করতে হয়। তাঁর বক্তব্য-এর অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে:

'The vitality of Soviet literature, the most progressive literature in the world, resides in the fact that it has not, nor can it have, any other interests save those of the people and the state. The task of Soviet literature is to help the state correctly to educate the youth, cater to its needs, rear the young generation to be buoyant, confident in its cause, undaunted by difficulties and prepared to surmount all obstacles.
That is why the advocacy of apolitical and idea-less art, of "art for art's sake", is alien to Soviet literature, harmful to the interests of the Soviet people and state and must not be allowed in our journals.'[২৬৫]

খুব সঙ্গতভাবে সেদিন(১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের আলোচনায় এ প্রশ্ন এসে পড়েছিল যে, সাহিত্যে ও শিল্পে দলীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া যায় কিনা অথবা দলীয় হস্তক্ষেপ সঙ্গত কি না। জদানভের বক্তব্যপ্রসঙ্গে ১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দের সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসের বক্তব্যও আমাদের স্মরণ করা দরকার। কেননা, স্ট্যালিনের নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করে এই কংগ্রেসে একাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে সোভিয়েত সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পের গণপ্রসারের কথা গভীর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে:

'...the first All-Union Congress of Soviet Writers places on record that, as a result of the victorious building of Socialism and the rout of the class enemies of the proletariat and toilers of the U.S.S.R., the Soviet literature of the peoples of the Soviet Union has grown into a mighty force for socialists culture and for the education of the toiling masses in the spirit of socialism. Under the leadership of the heroic Communist Party of the Soviet Union, with Comrade Stalin at its head, and thanks to the Party's daily help'[269],...(Resolution on the report of Maxim Gorky, The Co-report of S.Y.Marshak and the report on the Literature of the National Republics.) ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রস্তাবে দুই বাক্যতা হিসেবে জ্দানভ তাঁর ভাষণে সাহিত্যিকদের উদ্দেশে যেসব মূল্যবান কথা বলেন তার পূর্বসূত্রগুলি প্রাসঙ্গিক কারণেই আমাদের কাছে জরুরি। বিপ্লবের পর (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে সোভিয়েত রাশিয়াকে সুদীর্ঘ বিপুল সংকুল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তার সে পথ ছিল যথার্থই দুর্গম ও কণ্টকিত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর রাশিয়ায় মুক্তির প্রাণবন্যায় আত্মবিকাশের শুরু। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠিত ও সক্রিয়করণের একদা বহুবিতর্কিত প্রাথমিক কাজ। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণযোগ্য (এবং সফলও বটে) প্রথম লেখক-কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা এবং আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে লেখক শিল্পীদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি। কেননা জার্মানিতে হিটলার তখন ক্ষমতাসীন, কয়েকটি প্রধান পুঁজিবাদী দেশ---ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার সংশয়-জাগানো প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ, এ অবস্থায় স্বদেশরক্ষা আর সমাজবাদের সংগ্রামে সাহিত্যকে প্রধান হাতিয়ার করে গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা সামরিক কার্যক্রমের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং এর মধ্যে সাংগঠনিক অসংগতিও চোখে পড়বার নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যেদিন 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (সংক্ষেপে এন. ই. পি., প্রয়োগকাল ১৯২১-২৮ খ্রীষ্টাব্দ) চালু করলে সোভিয়েত লেখকরা এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন, নতুন চিন্তাধারা এর ফলে শুরু হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লেখকদের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনে টেনে আনা হলে 'আর. এ. পি. পি.' প্রভৃতি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। বলা হয়:

'The decision of C.C.of the CPSU of April 23,1932'On the Reconstruction of,Literary and Artistic Organizations'put an end to the RAPP,which had become an obstacle to the further develop of Soviet Literature.' এই সিদ্ধান্তের পরেই অগাস্ট, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে এ. এ. জদানভ-এর বক্তৃতা হয়।'Soviet Literature --The Richest In Ideas,The Most Advanced Lit rature', এছাড়া অন্যান্য বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ম্যাক্সিম গোর্কি---'Soviet Literature', কার্ল রাদেক--'Contemporary World Literature and The Tasks Of Proletarian Art', নিকোলাই বুখারিন--'Poetry,Poetics And The Problems Of Poetry In The U.S.S.R', এ. আই. স্টেট্স্কি--- 'Under The Flag Of The Soviets,Under The Flag Of Socialism'.
জদানভ তাঁর বক্তৃতায় স্ট্যালিনের কথার পুনরুক্তি করে বলেছিলেন, লেখকরা মানবাত্মার কারিগর। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জদানভ বলেন,

'...it means knowing life so as to be able to depict it truthfully in works of art,not to depict it in a dead,scholastic way,not simply as"objective reality",but to depict reality in its revolutionary development.' জীবনের বাস্তবতার ভূমিতে মানবাত্মার কারিগরের অবস্থিতি, জদানভ বলেন,

'To be an engineer of human souls means standing with both feet firmly planted on the basis of real life.And this in its turn denotes a rapture with romanticism of the old type,which depicted a non-existent life and non-existent heroes ,leading the reader away from the antagonisms and oppression of real life into a world of the impossible,into a world of utopian dreams'.' তিনি

প্রসঙ্গত দাবি করেন, সোভিয়েত সাহিত্য বস্তুবাদী, বস্তুবাদ রোমান্টিকতা-বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু সোভিয়েত সাহিত্যে যে রোমান্টিসিজম তা হল নতুন ধরনের, বলা চলে বৈপ্লবিক-রোমান্টিসিজম। তিনি আরও একটি জরুরি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে। সোভিয়েত সাহিত্যের বিপক্ষে ভিন্নশিবির উচ্চারণ করে থাকেন, এই সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক। তিনি তা দৃপ্ততার সঙ্গে স্বীকার করেন, বলেন, 'Yes, Soviet literature is tendencious, for in an epoch of class struggle there is not and can not be a literature which is not class literature, not tendencious, allegedly non-political.'

সাহিত্যের উদ্দেশ্যমুখীনতার জন্যে জ্দানভ গর্বপ্রকাশ করেন, বিশেষত যে সাহিত্য ধনতান্ত্রিকতার সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানবশ্রেণীকে মুক্তি দেয় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথেষ্ট গর্বের কারণ, তিনি বলেন,

...'we are proud of this fact, because the aim of our tendency is to liberate the toilers, to free all mankind from the yoke of capitalist slavery.'[২৬৫]

প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতির এই 'লাইন' ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গৃহীত 'লাইন'। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের 'লাইন' তৈরি হয় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে। জি. দ্রাগোশী-এর তত্ত্ব 'Nationalist in form, Socialist in content' এই সময়কার নতুন প্রচারিত তত্ত্ব। জ্দানভ যুদ্ধের পরবর্তী 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' বিশ্লেষণ করে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এই তত্ত্ব অনুসরণ করেন, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে জ্দানভের 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' পুস্তিকাটি বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। জ্দানভের অনূদিত বক্তব্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

'সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদকে আরও শক্তিশালী করা, নতুন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্রবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট পন্থীয় শাসনব্যবস্থা ও আন্দোলনকে সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শিবির সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির উপর নির্ভর করতে প্রস্তুত রয়েছে। গত যুদ্ধের সময় যারা ছিল মিত্র তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যারা ছিল শত্রু তাদের সমর্থন করতেও তৈয়ার রয়েছে।

দ্বিতীয় শিবিরে রয়েছে ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তিসমূহ। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতন্ত্রগুলি হল এই শিবিরের

ভিত্তিভূমি। রুমানিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের মত যে সব দেশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে পা বাড়িয়েছে, তারাও এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, ভারতবর্ষ, মিশর ও সিরিয়া এই শিবিরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সব দেশের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বসূত্রে বদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, পরাধীন দেশসমূহে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধারা এবং প্রত্যেকটি দেশের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রমূলক শক্তি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের সমর্থক। এই শিবিরের উদ্দেশ্য হল নতুন যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসারকে প্রতিরোধ করা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং ফ্যাসিজমের যে-উপাদান আজও অবশিষ্ট আছে তাকে নির্মূল করা।'[২৬৮]

এই 'লাইন' সাহিত্যনীতি ও রাজনীতিতেও তার আগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশে অতঃপর শুরু হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের ও বুর্জোয়া-শাসকের চরিত্র-বিশ্লেষণের আর এক বিতর্কিত অধ্যায়। প্রসঙ্গত একথা আমাদের স্মরণ করা দরকার, জ্দানভ বলেন, 'শুধু যে প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করা তাই নয়, বরং সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা, তাকে আক্রমণ করাও তাদের কর্তব্য'--- উদ্দিষ্ট সোভিয়েত লেখকগণ হলেও বুর্জোয়া-চরিত্র বিশ্লেষণে এই 'লাইন' আমাদের দেশেও গ্রহণ করা হয়।

এরই পাশাপাশি (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে আলোচিত হয় লুই আরাগঁ ও রজের গারোদি'র ঐতিহাসিক সাহিত্যনীতিসংক্রান্ত বিতর্ক।[২৬৯] রজের গারোদি ও পিয়ের এরভে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, গারোদি জানান, শিল্পের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কিছু থাকতে পারে না, শিল্পী মুক্ত হয়ে চলবেন। এরভে'র বক্তব্য, 'কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলেকোনো পদার্থ নেই, আর্টের ক্ষেত্রে সমালোচক নন্দনতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করতে পারেন'। আর আরাগঁ দৃঢ়ভাবে জানালেন, 'নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে। এটা না-মানার অর্থ হল---শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা।' ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, 'এই বিতর্কে এটা পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এল যে, ফ্রান্সের অন্যান্য লেখকেরা তো বটেই, মতাদর্শের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও দ্বি-ধা বিভক্ত।'[২৭০] বিষ্ণু দে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে গারোদি ও এরভে'র বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন করেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় আরাগঁকে সমর্থন করে বলেন, 'আর্টকে পুরোপুরি যাচাই করার মতো সমস্ত মালমশলা হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই, চূড়ান্ত কথা বলাও হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের লড়াই, বিশেষ করে অপরিহার্য মতবাদগত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যান্য জ্ঞানের মতো মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে, যাচাই করতে

থাকবে আর্টের মান। বিচারের এই বাস্তব মানদণ্ড না থাকলে সাহিত্য-বিচার করা যায় না। তাই মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা মতাদর্শগত লড়াই ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েই করতে হবে।' বিষ্ণু দে-র মতকে সমর্থন জানান হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায়কে সমর্থন করেন রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, অমিল কাঞ্জিলাল, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ প্রমুখ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় রায় ছিলেন বিষ্ণু দে-র পক্ষে। দ্বিতীয় দিনের আলোচনাসভায় তারাশঙ্করের সঙ্গে মতবৈষম্য ঘটে কোন কোন কমিউনিস্ট লেখকের। কোন সিদ্ধান্তে সেদিন পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। রাজ্য কমিটির নতুন পার্টি নেতৃত্ব যে প্রাদেশিক সাব-কমিটি গঠন করে দেন ইতিপূর্বে (এই কমিটিতে ছিলেন গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, বিনয় রায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন ও সোমনাথ লাহিড়ী), সেই কমিটির নির্দেশে শেষ দিনের আলোচনায় কেবলমাত্র অংশগ্রহণ করতে পান সাহিত্যশিল্পীদের পক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায় ও বিষ্ণু দে। কণ্ঠরোধ করা হয় অপর শিল্পীদের।[281] ফলে সুষ্ঠু সমাধান অথবা স্থির কোন সিদ্ধান্ত এর থেকে পাওয়া যায় নি। ধনঞ্জয় বাবু মনে করেন, এই ঘটনার পর থেকেই মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 'ক্রনিক বিষক্রিয়া' শুরু হয়ে যায়। সুধী প্রধানও এতে একইসঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রামের 'বিষক্রিয়া' লক্ষ্য করেছেন।

সমসাময়িক একটি প্রবন্ধ থেকে এই মতাদর্শের লড়াইয়ের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রদ্যোত গুহের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'[282] শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচ্য বিতর্কের আবহাওয়াকে অনেকখানি ধরে রাখা হয়েছে। লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও বুর্জোয়া-সংস্কারবাদবিরোধী জ্দানভের বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধার করে লেখক অতঃপর এই বলে শুরু করেছেন--- 'ভারতীয় মার্কসবাদীদের আত্মসমালোচনার বিবরণীতে দেখা গেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজ ধরে চলা, পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই সংস্কারবাদ এত দীর্ঘকাল ধরে সংগোপনে তার ধ্বংসাত্মক কাজ করে গেছে যে তার সর্বনাশা প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে---আন্দোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে গেছে। সংস্কৃতি আন্দোলনও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ দাঁড়িয়েছে---বুর্জোয়া 'সংস্কৃতিবিদদের' কাছে নতিস্বীকার, বুর্জোয়াদের কলুষিত ঐতিহ্য সম্পর্কে মোহাচ্ছন্নতা, এক কথায়, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ, বুর্জোয়াদের কমনীয় থাবার আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রেম বিলোবার প্রবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকখানি এগিয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে সংস্কারবাদের ক্ষতিকর প্রভাব এখনও কাটে নি।'

প্রাবন্ধিক ভবানীসেন ও স্তালিনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার করে বলেন, 'শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই কারণেই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। যা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী লড়ছেন, লড়বেন তাতেই যদি ঘুণ ধরে---তবে তা যে কি মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।' অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন, সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সংস্কারবাদের মূলোচ্ছেদ করা প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। তিনি তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, গোপাল হালদার, নরহরি কবিরাজ প্রমুখের 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'বিবেকানন্দের পথ ও মত' নামক বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের যুক্তিজাল ছিন্ন করে ভবানীসেনের বক্তৃতার আলোকে সমস্ত বিষয়টি দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। এক জায়গায় বলেছেন---'অতীতের কোন্ ঐতিহ্য আমরা গ্রহণ করবো শ্রমিক-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিসাবে, তার বিচার হবে---কার রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণা, জনতার মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রামের সমর্থন গ্রহণ করেছেন কে? গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠি হবে তার শিল্পকর্ম 'শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণায় প্রাণবন্ত'। এ ঐতিহ্য খুঁজতে হবে ১৮২৫-৭৫ সালে ভারতের যেসব গণ-বিদ্রোহ ঘটেছে তার নায়কদের মধ্যে। এই নিরিখেই যাচাই করে নিতে হবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র---সবাইকে।' এই বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বামপন্থার তীব্রতা। এর সহায়ক যেসব ভূমিকা আসলে ভবানীসেনের বক্তব্যের মধ্যেই রয়ে গেছে।

১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। নিঃসন্দেহে একটি দেশের ও জাতির জীবনের ইতিহাসে এটি এক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অধ্যায়। ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-শাসক কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বাধীনতাকে দেখেছে সন্দেহের চোখে, তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে--'Was it independence? This was a vexed question until 1955 when we agreed that it was independence. Meanwhile different interpretations were given not only by our party but also by international communist circles.' কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে 'স্বাধীনতা'কে আখ্যায়িত করল---

'an advance and a weapon in the hands of the people but not complete freedom' হিসেবে। ৩ অগাস্ট, ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি নতুনভাবে সংগ্রামের ঘোষণা করল--

'to win complete independence for our country', তারা চায়-- to 'establish fraternal cooperation between India and Pakistan as a first step towards voluntary reunion of our motherland'। নবম

পার্টি অধিবেশনে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) জ্দানভ ঘোষণা করেন,

'they are seeking to keep India and China under the sway of imperialism and in continued political and economic bondage'

আর ২১ জানুয়ারী, ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে 'পিপলস এজ'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হল--

'it was a 'blasphemous lie to assert that freedom has been achieved... national leadership has accepted sham freedom'.[২৮৬] অতঃপর কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান হয়ে দাঁড়াল 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'।

২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে বি. টি. রণদীভে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর থিসিসে জাতির জীবনে যে সংকট মুহূর্ত দেখা দিয়েছে তার বিশ্লেষণ করে জাতীয় সরকারের ত্রুটি নির্ণয়ে ও মূল্যায়নপ্রসঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ অথচ বিতর্কসাপেক্ষ মন্তব্য করেন। রণদীভের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করা হল:

A) 'For the present it is enough to say that theduring the entire period of war we failed to study the profound economic changes that were taking place in India. We totally forgot that Marxism lays down that until we understand the basic economic changes, we can not come to clear and correct conclusions about the political situations.'[288]

B) 'We accepted a large number of economic formulations made by bourgeois economists and more and more forgot that the only solution of the crisis was through a change of the social order brought about by the fighting masses. It is because we missed all this that today we are putting the entire issue before the Congress, because it is necessary to understand once again that ours is a colonial agrarian country, and the crisis cannot be solved without an agrarian revolution.'[২৮৯]

C) 'We characterise here the National Government as the Government of national surrender, of collaborators, a Government of national compromise. Thus in place of our former wrong characterisation about the Government as one of an advance with whom we should have a joint front, we have now the characterisation that it is a Government of national surrender and collaborations; the conclusion that follows, therefore, is that it is the basic policy of the working class and its Party to oppose the Government, and this is what we have sharply underlined.'[283]

D) 'More and more the people are coming to the conclusion that the national Government is guided by the vested interests; more and more they are seeing the link between the Indian Capitalists and the national leaders. Out of this disillusionment will come the demand for another Government, and it is the duty of the Communist Party to consciously guide the people in fighting for that demand boldly and decisively.'[289]

E) 'The programme of the democratic movement can be implemented only when the state-power belongs to classes which are interested in full democracy and from which all opponents of democracy are excluded. Such a state will be based on the alliance of workers, peasants and the oppressed petty bourgeoisie, under the leadership of the working class. It will be a peoples' democratic state based on the alliance of anti-imperialist classes, workers, peasants and the oppressed petty bourgeoisie, under the leadership of the working class, and from which all collaborationists and exploiting elements are excluded. It will be based upon direct rule of

the toiling people in place of the present bureaucratic system.'[286]
উপরিউদ্ধৃত মন্তব্যের পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় রণদিভের নতুন রণনীতি তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হয়েছিল। বুর্জোয়াশাসক ও বুর্জোয়ামানসিকতার বিশ্লেষণে ভারতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। রণদিভে বিস্মৃত হয়েছিলেন মার্কসের কথা---'কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর'---বর্তমানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু অতীতের সামুহিক ঐতিহ্যের অস্বীকারের পেছনে অবশ্যই হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটল, তার মূল্যায়ন অস্বীকার করা উগ্রতার নামান্তর। কেননা স্বাধীনতা আন্দোলন ঈপ্সিত ছিল ভারতবর্ষের সমগ্র জনগণের, আর এই আন্দোলনে সামিল হন জাতীয় কংগ্রেস তো বটেই, কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট, মুসলিম লীগ, লেবারপন্থী মানবেন্দ্র রায়ের গোষ্ঠী, সর্বোপরি এই আন্দোলনে বিরাট সংখ্যক জনগণের অবদানও কম নয়। স্বাধীন দেশের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয় জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের উপর। জাতীয় বুর্জোয়ারা এই ক্ষমতা লাভ করেই যে পথ গ্রহণ করে তা খুব স্বাভাবিকভাবেই ধনতন্ত্রের পথ এবং এই পথে জাতীয় সরকারকে দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। এখন প্রশ্ন, এই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা বিচারে রণদিভে কোন নির্দেশক নীতি গ্রহণ করেন---গঠিত বিকৃত বুর্জোয়াদের সার্বিক অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি অস্বীকার ও আক্রমণ(জদানভ লাইন), এরই মধ্যে কি প্রতিফলিত হয় না নেতিবাচক একটি সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি? অতীতের যা কিছু মহত্তর তাকে আত্মীকরণের কথা বলেছেন লেনিন। তাহলে এই ঝোঁক কেন?অন্যদিকে রণদিভে অস্বীকার করতে চেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির এতদিনকার সংগ্রামের মূল্যসমূহও। ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দ অবধি পার্টির সম্পাদক পি. সি. যোশীর রণনীতিকে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে সংস্কার-পন্থানুগত, যা নাকি সার্বিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়(তাঁর ভাষায় 'during the entire period of war we failed' ইত্যাদি ইত্যাদি)---এখানে মনে রাখতে হবে যে মাঝখানে ঘটে গেছে দুর্ভিক্ষ, তেভাগা-আন্দোলন, নৌ-ডাক-বিমান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ, কোথাও ধর্মঘট, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিপ্লব, এই অবস্থায় ব্যর্থতার বিষয়টির উপযোগিতা সন্দেহজনক। সর্বোপরি, মানতে হবে, জাতীয় গভর্নমেন্টের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে রণদিভের ভূমিকার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে মস্কোর তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টের(১৯৪৩-এ স্ট্যালিন কমিন্টার্ন ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলেন কমিনফর্ম, এর মধ্য দিয়ে স্ট্যালিনের চিন্তাধারাও অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে বিশেষ ছাপ ফেলত) যান্ত্রিক 'লাইন', বাস্তবিক, এই যান্ত্রিকতার সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে বিপ্লবকামী দেশগুলিতে আন্দোলনগুলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও ব্যতি-

আধিপত্য ও নেতৃত্বের প্রভাবের দ্বারা পার্টি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক কর্মসূচী রূপায়িত করেছে। চীনে মাও সে-তুঙের সফল নেতৃত্বই তার প্রমাণ। তবে, জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় বুর্জোয়া-চরিত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে এত দ্রুত জাতীয় পরিস্থিতিকে অবনতি ও অধঃপতনের চূড়ান্তে উপনীত করে নি অথবা পরিস্থিতি এমন সংকটজনক অবস্থায় উন্নীত হয় নি যার জন্যে বিপ্লবের আহ্বান এতটা জরুরি ছিল---রুশদেশের লেনিনের এই তুলনাত্মক ব্যাপারটি লক্ষ করবার। রুশদেশে-লেনিনের আর একটা বিষয় লক্ষণীয়---কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অংশকেই এই বিপ্লবের সর্বাধিকার সমর্পণ করা হয়েছে, একটি অংশে বিপ্লবের সমস্ত লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা মার্কসবাদসম্মত নয়। আন্দোলনগুলি বিভিন্ন ফ্রন্টে, যেমন, কৃষক, শ্রমিক, যুবক, নারী, কিশোর প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে বিস্তারিত করবার যে স্বতঃস্ফূর্ত দাবির মর্ম অনুভব করে, এতে তাও করা হয় নি, বৈপ্লবিক চেতনার সঙ্গে এই বিরোধ পরিণতিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্যাপকার্থে, সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে রুশদেশে সহজেই অতি-বাম পথ অনুসরণ করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে লেনিনের পরামর্শ হল, দক্ষিণপন্থা ও অতি-বামপন্থার মাঝামাঝি অবস্থানই বিপ্লবী-কৌশলের সঠিক পথ।

'জার্মানিতে বামপন্থী কমিউনিজম' নিবন্ধে 'নেতা', 'পার্টি', 'শ্রেণী', 'জনসাধারণ'---এদের পারস্পরিক তাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়ে লেনিন পেটি-বুর্জোয়াসুলভ বিপ্লবী-মানসিকতার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পুরনো সমাজের অস্থিমজ্জাগত রীতিনীতির বিরুদ্ধে হল একটি অনবচ্ছিন্ন লড়াই, কখনও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে, কখনও রক্তপাতহীনতার মধ্য দিয়ে, কখনও শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আবার কখনও সহিংসনীতি গ্রহণ করে সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠনে নিযুক্ত হয়। তাছাড়া বহু মানুষের অভ্যাস একটা প্রচণ্ড শক্তি---এই অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে একটা শক্তিশালী পার্টিকে অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, মানুষের আস্থাভাজন হতে হয়, জনতার মনোভাবকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও প্রভাবান্বিত করাও তার কর্তব্য হয়। লেনিনের ভাষায়--

'The dictatorship of the proletariat means a struggle — bloody and bloodless, violent and peaceful, military and economic, educational and administrative — against the forces and traditions of the old society. The force of habit in millions and tens of millions is a most formidable force. Without a party of iron that has been tempered in the struggle, a party enjoying the confidence of all honest people in the class in question, a party capable of watching and influencing the mood of the masses, such a struggle cannot be waged successfully.'[২৮৯]

থিসিসের বক্তব্যেই প্রকাশ, কমিউনিস্ট পার্টি জনতার মনোভাবকে মর্যাদা না দিলে কোন বৃহৎ ক্ষতি-কারক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। রণদিভের থিসিসের এই তাত্ত্বিক-যুক্তি তৎকালীন সাহিত্যেও প্রচারিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক রণনীতি ও সাহিত্যের রণনীতির একত্র সমাবেশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাছাড়া সুধী প্রধানের প্রযুক্ত বক্তব্যে প্রকাশ যোশীবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা। তাঁর বক্তব্যকেও অনেকে মেনে নিতে পারেন নি, সুধীবাবুর মতে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশাসকের রূপগুলিকে পুরণচাঁদ যোশী অত্যন্ত ছোট করে দেখিয়েছেন। তাহলে ধরে নিতে হয়, রণদিভে দক্ষিণপন্থী যোশীবাদী নীতির একটি সচেতন প্রতিক্রিয়া মাত্র।

এই 'বামপন্থী বিচ্যুতি' বা 'লেফট ডেভিয়েশন' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন 'পরিচয়'কে ঘিরেও উপস্থিত হয়। তবে এটা সীমাবদ্ধ ছিল সাহিত্যনীতিসংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে এবং এর পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, যা সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের বিরোধী বাতাবরণের অনুকূল।

সুবোধ দাশগুপ্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত 'প্রভাতী' পত্রিকার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নূতন সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের বিতর্কিত অংশে বলা হয়:

ক) 'কয়েকজন শিল্পী ধার-করা বিদ্যা নিয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলেন। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও যেমন কুলীন হতে পারল না, স্লোগানের অনুপান পেয়েও লেখকরা তেমনি প্রগতিশীল হতে পারে না। তাঁদের লেখার ভেতর নূতনত্ব অনেক কিছুই পাওয়া গেল কিন্তু প্রাণ পাওয়া গেল না।'

খ) 'প্রগতির জন্য ফরমাইশী লেখা হতে পারে না, প্রগতির নোটবুক মুখস্থ করে একটা জাতি প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে কি না সন্দেহ। ...লেখকেরা নিজে কেউ প্রগতিশীল নন কারণ ...লেখকরা কেউ বিপ্লবী নন।'

গ) ...'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের এই পাল্টা জবাব। কিন্তু এ ধরনের পাল্টা জবাবে আমরা বিচলিত হই নি। আমাদের বিচলিত করেছে 'প্রগতি'র ধ্বজাধারী সাহিত্যিকরা। কারণ তাঁরা প্রগতির নামে যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন তার সঙ্গে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের গুণগত প্রভেদ নেই।'[250] ...

এছাড়াও সুবোধ দাশগুপ্তের পরামর্শ ছিল সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদকে গ্রহণ করা ও সকল রকমের প্রভুত্ব ও বিধিনিষেধকে উচ্ছেদ করা। কিরণকুমার সান্যাল জবাবী প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখান প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে সূক্ষ্মভাবে সরলরেখায় টেনে আনা যায় না, অবশ্য তিনি নূতন সাহিত্য রচনার আন্দোলন-কেও স্বীকার করেন এবং মেনে নেন প্রগতিশীল সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা। তিনি মত দেন সাহিত্যিক ঐক্যবদ্ধতার সপক্ষে।[251] এরই জের টেনে ধীরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'প্রগতিশীল' কথাটা সংস্কারপন্থী--

---সুতরাং বর্জনীয়।'প্রগতিশীল' সাহিত্যিকের কর্ম নয় নিষ্ঠুর বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার গুণগান গাওয়া করা। তাঁরা 'নিষ্ঠুর', 'ভাব', নীতি'---সবই মানবেন। খালি, তাঁদের মধ্যে যেটুকু মন্দ তাকে বাদ দিয়ে। সুবোধবাবু বোধহয় চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যের সূচনা।'[২৫২] যতটি গেছে সুবোধবাবুর পক্ষে। বিপক্ষে প্রভাতকুমার মত বলেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে। তিনি বলেন যে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ উদ্ভবের সূচনায় গ্রহণ করেছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী ভূমিকা, তখন তার নাম ছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।-'উক্ত সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে, বিশেষ করে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ফ্যাসিস্টমূলক মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করা।...ফ্যাসিজমকে প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যুগোপযোগী প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিকাশের কাজেও অগ্রণী হন।' এঁদের কৃত প্রগতি সাহিত্য অতীতের ঐতিহ্যকে স্বীকার করে সুস্থ সবল সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যৎ-এর দিকে সার্থক পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে 'আধুনিক সমাজ জীবনের সর্বমুখী ধারাটিরও পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে জনসাধারণের দিকে আহ্বান করেছিলেন, প্রগতি আন্দোলনে তার উপস্থিতি ও সাক্ষাৎ মিলেছে। তিনি বলেন, 'সাহিত্য, প্রগতিসাহিত্য হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসী সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পেছনে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও আধুনিক যুগের জীবনবোধের কড়া তাগিদ কাজ করছে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা সাহিত্যকে যুগোপযোগী পর্যায়ে এনে তার গতিধর্ম বজায় রাখা, তাকে সজীব করে তোলা। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে কংগ্রেসী সাহিত্য কথাটি নিছক সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসী মতবাদের পূর্ণ সার্থকতা থাকলেও সাহিত্যে তা অচল।' তিনি প্রগতি-সাহিত্যিকদের লেখাকে আধুনিকতার অনুসারী বলেন, এবং অস্বীকার করেন একথার যে এঁদের(যেমন-তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবীন লেখক প্রমুখদের রচনা) সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে প্রচারবাদ। সমালোচনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদ তিনি মেনেছেন, তবে একটু সতর্কতার সঙ্গে:'সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে আমরা লেখকের কাছে কোনো মতাবলম্বী তার দাবী করতে পারি না' বলে। সাহিত্য সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদের তালিকা হবে না---এঙ্গেলসের মন্তব্য স্মরণ করেছেন এই কারণে :'The more the views of the author remains hidden, the better of art;' ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত প্রধান নয় তাঁর কাছে। সুবোধবাবু সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রভুত্ব না-মানার বিরোধী---এ প্রসঙ্গে প্রভাত মত বলেন, 'এ কথা একেবারেই অসত্য। কোনো কিছুকে না মানা একমাত্র এ্যানার্কিস্টদের পক্ষেই সাজে। কিন্তু এ্যানার্কিজমকে ত আজ প্রগতিশীল মতবাদের ক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হয় না।'[২৫৬]

অমিতা গোস্বামী সুবোধ দাশগুপ্তের জবাবে 'নূতন সাহিত্য' প্রবন্ধে কল্পাদিমেশে যে সম্প্রতি সাহিত্য-শিল্প-

সংক্রান্ত বিতর্ক হয়ে গেছে তাতে অংশগ্রহণকারী গারোদি, এরভে, আরাগঁ-র মতামতগুলি উল্লেখ করেন। বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এর যোগসূত্র তিনি ঠিকই ধরেছেন। এই আলোচনায় অশোক মিত্র ও অরুণ সরকার 'প্রভাতী' পত্রিকার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন তাও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে লেখককে, সে বিষয়ে সকলেরই উক্তি প্রায় একপ্রকারের, অর্থাৎ সকলের মতেই সোভিয়েট বিদ্বেষ---ফ্যাসিবাদের স্তাবক সাজতে পারেন না কোন বিবেকবান লেখকই। সমাজ প্রগতি যে আপনা থেকেই সম্ভব হয়ে উঠবে তা নয়, তার সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার বিষয়ে দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে হিরণবাবুর কোন মতানৈক্য নেই।' তিনি আরও বলেন, 'কিছু মানব না' অথবা 'যে বিধিনিষেধ টিকে রয়েছে তা একবারেই অস্বীকার কর' এ জাতীয় উক্তির মধ্যে সেদিনের নির্দিষ্ট বামপন্থী বিচ্যুতি (Left deviation) ধরা পড়েছে, যা আজকের সংগ্রামশীলতাকে এগিয়ে না নিয়ে বরং পিছিয়ে দেবে, শিল্পী পক্ষে তো ঐ বিচ্যুতি তাঁকে বর্তমান জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই সাহায্য করবে। ...তাছাড়া যে সব লেখকদের মনে সংস্কার বেঁচে রয়েছে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁদের সঙ্গে একত্র সম্মিলিত ফ্রন্টে থেকে যে লড়াই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে করা চলবে, তাকেও এক আঘাতে দুটুকরো করে দেওয়া হবে। ...প্রগতিশিল্পীদের মধ্যে দলকেন্দ্রিকতা (Sectionalism) কিছু বেশি পরিমাণে রয়েছে, যা একটা বড়রকমের ত্রুটি, তা থেকে সর্বাঙ্গীণ আবশ্যকতা ফ্যাসিবিরোধী সংঘ গড়তে এই সেদিন তাঁরা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সে ত্রুটি দমন হয়ে যায় নি।' তিনি আরও বলেন, 'সম্মিলিত ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা কখনোই প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে আপোষ প্রবৃত্তিরূপে নির্ণীত হতে পারে না। আরও সুবোধবাবু যেন ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন যে পূর্ববর্তী শিল্পীদের থেকে পা বাঁচিয়ে থাকলেই যেন আজকের সাংস্কৃতিক আদর্শকে অক্ষত রাখা যায়। কিন্তু পূর্বতনদের কাছ থেকে কিছুই শিক্ষণীয় নেই কি?'[২৫৪]

অনিলা গোস্বামীর শেষ মন্তব্যে বোঝা যায় যে, সম্মিলিত ফ্রন্টের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ অপেক্ষা, ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখাই যেন তখন মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মতাদর্শের সংগ্রামকে এড়িয়ে থাকার প্রবণতাও তাঁর মন্তব্যে একেবারে অস্বীকৃত নয়। আসলে দুটি মতাদর্শের সংগ্রামই এমন সমালোচনামূলক বিতর্ক-আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে। পরে এই সংগ্রামই রণদিভের উগ্র বামপন্থী মনোভাবের বা তথাকথিত বিপ্লবীয়ানার পরিণত হয়েছে। এসবই ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিককার পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য।

১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দে দুটি বড় ঘটনা প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ২৬এপ্রিল-কলকাতায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় গণনাট্যসংঘের অধিবেশন। তিনদিনের সম্মেলন। 'ধরতি কে লাল'--গণনাট্যের প্রথম প্রযোজিত ও পরিচালিত বাকচিত্র এই এখানে প্রদর্শিত হয়। সাম্প্রদায়িক

হাঙ্গামা সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। কয়েকটি তথ্য থেকে জানা যায়, বোম্বের কংগ্রেসী সরকার গণনাট্যের কেন্দ্রীয় শিল্পীদের রচিত কাশ্মীরী গণসংগ্রামের ওপরে কয়েকটি সংগীত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নৌ-সেনা বিদ্রোহের কথা মনে রেখেই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রতিবেদক জানিয়েছেন আরও একটি দুঃসংবাদঃ 'দুর্দিনের উল্লিখিত বাধা-বিপত্তির জন্যেই 'গণনাট্য সঙ্ঘে'র 'কেন্দ্রীয় শিল্পী দলে'র প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া স্থির হয়েছে। কারণ, ওসব বাধায় তার ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হচ্ছিল না।'[১৫৫]

১৩মে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সুকান্তের মৃত্যু প্রগতি আন্দোলনে বড় রকমের ক্ষতির চিহ্ন রেখে গেছে। 'পরিচয়'র দ্বিতীয় খন্ড, ষোড়শবর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪, সংখ্যাটি সুকান্তকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

১৬সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের, সকল দলের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক কর্মীদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভা আহ্বান করেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা গণনাট্য সংঘ, আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশন, এবং সিনে-টেকনিসিয়ানস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতিগণ। কিছুদিন আগে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের স্মৃতীশ বন্দোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ মিত্র দুষ্কৃতকের হাতে প্রাণ দেন। তাই এই ঐক্যপ্রচেষ্টা। এই সভায় তাই ঘোষণা করা হয়, 'যেসব ধর্মান্ধ, স্বার্থ-প্রণোদিত সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত বিভেদের সুযোগে আত্মপ্রকাশ করছে তারা মানবতার শত্রু।' হানাহানি দূর করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ সংকল্প গ্রহণ করা হয় দুটি প্রস্তাবে। অপর একটি প্রস্তাবে সংবাদপত্র, ছাপাখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা করপোরেশন দুই বাংলার গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের কাছে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠনের কাজে সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে প্রতি বছর শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশ করবার জন্যে একটি সংগঠন কমিটি গড়বার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যের স্বার্থে 'বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।[১৫৬]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে এই সময় ভাঙনের যে ঢেউ এসে লাগে তা কেবল মতাদর্শের সংঘাতে নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী অবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা সমাজজীবন বা ব্যক্তিজীবনকে গ্রাস করে, তারও একটা প্রতিক্রিয়া সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের বা তাকে টিকিয়ে রাখার সদিচ্ছাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। গণনাট্য সংঘের সক্রিয় কর্মী ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংকট' প্রবন্ধে এই ভাঙনের আভাস দিয়ে বলেন, 'আজকে

আমাদের চারপাশে যখন চেয়ে দেখি, দেখি প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে তাদের জীবনবোধের মাপকাঠি। চরম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় এসে পড়েছি আমরা। বুঝি না আমরা কি চাই, কি চেয়ে এসেছি এতদিন? শুধু তাই নয়, আমাদের কোন জ্ঞানই নেই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে, আমরা কিছু জানছি না, কিছু বুঝছি না।'[২০৭]

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে শহীদ হন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই ভেদবুদ্ধি সংগঠিত সন্ত্রাসবাদের আকারে ২৭ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে ডিকসন লেনে গণনাট্যকর্মীদের ওপর আক্রমণ চারবার করে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা ডিকসন লেনে প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সেদিন সন্ধ্যায় 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে' আগত সোভিয়েত, ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন, চীন, বর্মা প্রভৃতি বিদেশীয় প্রতিনিধিদের আলাপ-আপ্যায়নের জন্য একটি ঘরোয়া সমাবেশের আয়োজন করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গণনাট্য সংঘের শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ-এর পরিবার, সুজন, বন্ধুরা। এঁদের সামনেই আক্রমণ ঘটে। এর ফলে শহীদ হন সুশীল মুখোপাধ্যায় ও ভবমাধব ঘোষ। আহত হন আরও জনা-চারেক কর্মী। কলকাতার সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই এর নিন্দা করে বিবৃতি দেন। অতুল গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও অন্যান্য অধ্যাপক ছাড়াও একটি বিবৃতিতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গভীর বেদনার সঙ্গে বলেন, 'মর্মান্তিক বেদনাহত চিত্তে আমরা বাংলাদেশের জনসাধারণের নিকট এবং বাংলার ও পৃথিবীর শিল্পী-সাধারণের নিকট আজ বলতে বাধ্য হলাম---মানুষের অধিকার ও শিল্পীর জন্মগত অধিকার আজ এদেশে--কলকাতা শহরের বুকের ওপর রক্তের পঙ্কে লুটিয়ে পড়েছে। গত শুক্রবার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বৈঠকে সমাগত দেশ-বিদেশের যুবক-প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে যে নৃশংস আক্রমণ হয়েছিল, আমাদের কেউ কেউ তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, কেউ কেউ তার বলি। অন্ততঃ দুটি তরুণ প্রাণ আর আমরা ফিরে পাব না। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ আক্রমণ, এ হত্যা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ। আর বিদেশীয় অতিথির যে মর্যাদা ভারতবর্ষ চিরদিন দিতে অভ্যস্ত, তাও আজ এইভাবে নিঃশেষ প্রায়। যাঁরা শাসক, তাঁদের মর্যাদা এই ঘটনাবলীতে কতটুকু অক্ষুণ্ণ রইল জানি না, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের মানমর্যাদা আজ অবনমিত। সন্ত্রাসের পথই এদেশের বুকে রাজনৈতিক পথ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রা থেকে শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতাবোধ, জীবন্ত মানবতাবোধ---সমস্ত কিছুর চিতাশয্যা রচনা হচ্ছে আমাদের চোখের ওপর। এই শ্বাপদ-সংকুল পৌর-জীবনের মধ্য থেকে তবু আমরা শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও দেশের জনসাধারণ আর একবার আমাদের মহাপুরুষের নাম স্মরণ করে জানাই---মনীষীরা চারিদিকে

কে নিয়েছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, আজ এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে এ দেশের মানবতার প্রতিই আমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করব।'[২৫৮]

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী-মার্চে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পর স্বাধীন ভারত সরকার এই পার্টিকে ২৬-মার্চ বেআইনী ঘোষণা করে। গ্রেফতার হন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার।[২৫৯] এই ঘোষণা পার্টি কর্মীদের মনোবল খানিকটা যে দুর্বল করে দি[..]তা নয়। তরুণ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এই সময় লেখেন--'সকালের মুখ ঢাকে রুদ্র করাঘাতে/উঠে দেখি বেআইনী আমি,/ বেআইনী হয়ে গেছ তুমি।/ বেআইনী আমাদের পথ।' গ্রেফতার হন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লেখকদের গ্রেফতার ও বক্সা-ক্যাম্পে বিনা বিচারে আটক রাখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ করে 'পরিচয়ে' পত্র লেখেন। দুটি চিঠিই উল্লেখযোগ্য।[২৬০] বিষ্ণু দে এই সময় এই ঘোর দুর্দিনে 'সমুদ্রের নিরপেক্ষ অবস্থান'-এর নীতি গ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্টদের চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র'-এর মাধ্যমে তীব্র কশাঘাত করে চলেন।[২৬১] এই সময় প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি বামপন্থী উগ্রতা ও অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের ঝোঁক বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ বোধ করি 'নতুন সাহিত্য' (অনিল সিংহ সম্পাদিত) ও 'সাহিত্যপত্রে'-র মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। 'সাহিত্যপত্রে' কমিউনিস্ট লেখকরা সহযোগিতা করতে চান নি, কারণ, 'যেহেতু বিষ্ণুবাবুরা মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করছেন এবং প্রগতি লেখক আন্দোলন তথা পার্টির কর্মনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, সেইহেতু পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু হিসাবে গণতান্ত্রিক চক্রে তাঁদের আর স্থান হতে পারে না, এবং এই কারণেই 'সাহিত্যপত্র'-র সঙ্গে সহযোগিতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' এই যুক্তির পক্ষে সেদিন সায় দেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ, নীহার দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেন অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র পক্ষে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, গোপাল হালদার ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[২৬২]

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২-২৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলন। নীরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া ঘোষণাপত্রটি বিতর্কের প্রবলতায় বাতিল হয়ে যায়। গোপাল হালদার সম্মেলনের মূল সভাপতি হলেও তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার থাকায় কার্যকরী সভাপতি হিসেবে কার্য পরিচালনা করেন (প্রাক্তন সম্পাদকও) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সীতাংশু মৈত্র, নিরঞ্জন সেন ও জগন্নাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত কমিটি নতুন ঘোষণাপত্র রচনা করে এবং তা সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশিরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুনীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তুলসী লাহিড়ী, হিরণকুমার সান্যাল, মণিভূষণ দাশগুপ্ত, নরহরি কবিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সাজ্জাদ জাহেদী প্রমুখ।

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে উত্থাপিত হয় সর্বমোট ১৭টি প্রস্তাব। বলা বাহুল্য, রণদিভের থিসিসের প্রভাব এতে সহজেই অনুভব করা যায়। প্রস্তাবের প্রথমেই বলা হয় যে, ধনবাদী সভ্যতার সংকট পৃথিবীকে দুটি শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে---আজ লেখক-শিল্পীদের, বিশেষত মানব-প্রেমিক হিসেবে যে-কোন একটি শিবির বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে গান্ধিজীর নাম না করেও বলা হয় যে, তাদের জাতীয়-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত, ভারতের শাসক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার অজুহাতে তাদের সমর্থন করে চলেছে। তৃতীয় প্রস্তাবে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বকে স্বীকার করে ভারতের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণকে শান্তির অভিযানে সম্মিলিত করবার আহ্বান জানানো হয়েছে। চতুর্থ প্রস্তাবে 'ধনবাদী সংস্কৃতির প্রথম যুগে' 'সামন্তবাদী জীবনধারার' সমালোচনাকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু পঞ্চম প্রস্তাবে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়, 'ধনবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাধিপত্য শ্রমিকশ্রেণীকে ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে দাসত্বের স্তরে নামাইয়া ক্রমশ অধিকতর দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ধনবাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান সংকট।' ষষ্ঠ প্রস্তাবে ধনবাদী সংস্কৃতির মধ্যে 'মৃত্যু বিকৃতির' যে সুর আজ ফুটে উঠেছে তা প্রগতিশীলতার অন্তরায় বলে অভিহিত করা হয়। সপ্তম প্রস্তাবে রামমোহন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের মানবত্বের বিরাট সাধনাকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু 'পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্য ধনবাদী সমাজের অসুস্থ ভাবধারায় আচ্ছন্ন', এমন মন্তব্যের সঙ্গে ভবানী সেন, প্রদ্যোত গুহ, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ প্রমুখের মধ্যেকার গোষ্ঠীগত তীব্র তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বই যেন অন্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'মধ্যবিত্তশ্রেণীর অহমিকা আত্মকলহ, নৈরাশ্য, ভাববিলাস ও বিভ্রান্তি এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামান্য একটু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ছিল বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা মধ্যবিত্তের মনে একটা মিথ্যা জাতীয়তাবাদী 'প্রগতিশীলতার' ও মানবতাবাদের মুখোশ পরিয়া নানা বিভ্রান্তি জাগাইয়াছে এবং মধ্যবিত্তের আজকের বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত ও অভিভূত

করিয়াছে।'এই প্রস্তাবেই বলা হয়, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলতা সাহিত্য ও শিল্পকে আজকের দিনে বিনষ্টির দিকে নিয়ে চলেছে। অষ্টম প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে বিতর্ক-জটিল: 'বাঙলার ধনবাদী সাহিত্যেও শিল্পে শ্রমিকের গৌরবময় সংগ্রামের চিত্র স্থান পায় না। শ্রমিক-কৃষক-মানুষের হীন নিন্দাবাদে এই সাহিত্য মুখর। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার জয়স্তুতিতে ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের কুৎসা প্রচারের ধনবাদী প্রচার-সাহিত্যের ক্লান্তি নাই। ধনবাদী সাহিত্যিকদের কেহ কেহ আবার 'তৃতীয় শক্তি' সাজিয়া শ্রমিক-কৃষকের 'দাবীদাওয়া'র প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানান এবং 'অহিংস' ও 'উদার' মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কৃষককে স্বখাতসলিল হইতে 'উদ্ধার' করিতেছে---সযত্নে এই অপপ্রচার চালান।'তৃতীয় শক্তির' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রচার করেন, তাঁহারা 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে বা শিল্পে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান নাই, তাহা একান্ত 'বিশুদ্ধ' ও 'স্বয়ংসম্পূর্ণ', শিল্পীর আত্মপ্রকাশেই তাহা সিদ্ধ, তাহার সামাজিক সার্থকতার প্রয়োজন নাই, তাহাতে বিষয়বস্তুর মূল্য নিরর্থক, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যই একমাত্র বিচার্য।' এঁদের অভিহিত করা হয় 'ধনবাদের বেতনভুক প্রচারকে'র আখ্যায় ও 'ফ্যাসিবাদের উপযুক্ত দোসর' হিসেবে। নবম ও দশম প্রস্তাবে ভারতের প্রগতিবাদীদের অভূতপূর্ব মুক্তিসংগ্রামের প্রশংসা করা হয় ও ভবিষ্যৎ সামাজিক বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনার পথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে স্বীকার করা হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে গণবিপ্লব, গণসাহিত্য, গণশিল্পকে সক্রিয় কর্মের দ্বারা বাস্তবায়িত করে তোলবার আহ্বানই প্রধান।[২৬৩]

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এই সম্মেলনে খসড়া ঘোষণাটি নিয়ে যে ঝড় ওঠে তার খানিক আভাস পাওয়া যায় 'পরিচয়'র 'পাঠক-গোষ্ঠী'তে প্রকাশিত মণীন্দ্র দাসের একটি চিঠিতে। ঘোষিত প্রস্তাবগুলির প্রতি খানিকটা সমর্থন, খানিকটা অভিযোগ করে মণীন্দ্র দাস যে কথাগুলি লেখেন তার অনেকটাই অমূলক।

১। শ্রমিকশ্রেণীকে সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনায় টেনে আনার আহ্বান এই প্রস্তাবে রয়েছে, তবে তা সুস্পষ্ট নয়।

২। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, তাঁর মতে, ঘোষণাটিতে একটি কথাও নেই---এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ধনবাদের যে পরিমাণ বিরোধিতা করা হয়েছে, সামন্তবাদ সম্পর্কে ততটাই নীরবতা পালিত হয়েছে। তিনি আরও লেখেন---'প্রথম সংখ্যা 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র গুপ্ত প্রগতি সাহিত্যে নির্মম বিচারে যে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্য আমাদের সাহিত্য-আন্দোলন বিপুল ক্ষতি সহ্য করেছে। অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের ফ্রন্টকে বহুবিস্তৃত করার প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে আমাদের সংঘ বন্ধ দরজার নীতি অবলম্বন করেছিল।'প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'মার্কসবাদী' পত্রিকার চতুর্থ সংকলনে

প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোত গুহ 'বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' দিয়ে আন্দোলনকে একটা জঙ্গী রূপ দেবার চেষ্টা করেন। অপর প্রবন্ধটি 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'য়ও ভবানী সেন ঝ্দানভ-এর তত্ত্বকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন।[২৬৪] অল্পদিনের মধ্যে ভবানী সেন ও প্রদ্যোত গুহের এইসব রচনা মার্কসবাদী চিন্তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আনে এবং বিতর্কের দরজা খুলে দেয়। মণীন্দ্র দাশের আলোচনা এই ঘটনারই ইঙ্গিতবহ। তিনি আরও বলেন, ...'ভুল ধরার পর বহুদিন গত হলেও এবং সাহিত্য সমূহে বিদেশের এবং বিশেষ করে চীনের বহু মূল্যবান নজির আমাদের নজরে এলেও এখনও পর্যন্ত আলোচনা কাদা-ছোঁড়া-ছুঁড়ির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে, তা থেকে যে বিশেষ এগিয়েছে মনে হয় না।' মণীন্দ্র বাবু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে প্রাক্তন ভুলেরই পুনরাবৃত্তি। আলোচনার প্রথমেই তিনি জানান যে, প্রস্তাব দিতে লেখকদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে 'জনগণের হিতকামী' 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' সকল শ্রেণীর লেখক-শিল্পীদের আহ্বান জানানো হয়েছে, এমন কি কৃষকদের বিত্তশালী লোকদেরকেও এই ফ্রন্টে আহ্বান করা হলেও শ্রমিকশ্রেণীর কথা কোথাও বলা হয় নি। তাঁর বক্তব্য, . . .'প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তিই জানেন যে বোম্বাই এবং কলকাতার ট্রাম-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক আছেন। ...আমরা জানি, যে কোনও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মেরুদণ্ডই শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য কৃষক এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির সহযোগিতায়।' 'সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে চীন যে সংযুক্ত-ফ্রন্টের নীতি গ্রহণ করেছে তার অন্যতম নেতা কুয়ো মো-জো'র উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী সাহিত্যে ও শিল্পে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় নামতে চাইলে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে'। অন্যান্য শ্রেণীর নেতৃত্ব ও ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু নির্বিত্তশ্রেণী সংস্কৃতি জয় করেছেন। মণীন্দ্রবাবু মনে করেন, ভারতবর্ষে সংস্কৃতিক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু দেবার যোগ্যতা যথেষ্ট রয়েছে। মণীন্দ্রবাবু অপর প্রশ্নের অবতারণা করেন এই বলে যে, এতে জনগণের হিতসাধন বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রসঙ্গ উঠলেও সামন্তবাদের ধ্বংসের কথা ওঠে নি। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁরা ... 'সাহিত্যক্ষেত্রে "সামন্তবাদের ধ্বংসাবশেষের" অর্থ জানেন না অথবা বর্তমান পর্যায়ে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়তে প্রস্তুত নন।' তিনি বলেন, 'কমরেড মাও-এর সংজ্ঞা অনুসারে "সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ-বিরোধী নতুন সংস্কৃতির রূপটা জাতীয়, তার সর্ববস্তু হল বিজ্ঞানসম্মত এবং জনপ্রিয়"---এই উক্তির আলোকে সঠিক মন্তব্য করেন, 'প্রগতিশীল হিসেবে আমাদের বোঝা দরকার যে, দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন এবং সামন্তবাদী জোয়াল থেকে জনগণকে মুক্ত করতে না পারলে জনগণের সত্যকার হিতসাধন কিংবা স্থায়ী শান্তি কোনটিই

সম্ভব হয়।'অন্য একটি অভিযোগে তিনি বলেন যে, খসড়াটিতে কোথাও বিদেশি লেখকদের প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে কিছু জানানো হয় নি। তাঁর পরামর্শ, বিদেশের প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে দেশের প্রগতিশীল ধারার মিলন ঘটালে প্রকারান্তরে মার্কসবাদের ভিত্তি শক্ত হবে ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চেতনার বোধ প্রসারিত হবে। আর একটি অভিযোগে তিনি বলেন, জনগণের কাছ থেকে প্রগতিশীল লেখক-দের শিক্ষা নেবার কথা বলা হয় নি। বাস্তবতার আসল উৎস, তাঁর মতে, জনগণ, তাঁরাই বড় শিক্ষক।'[২৬৫]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দে এসে শান্তি-আন্দোলনে পরিণত হয়। সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ও আতঙ্ক এই দশককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘের কার্যক্রম এই পর্বে শান্তি-আন্দোলনে সক্রিয় হতে চেয়েছে, কিন্তু লক্ষ করবার, এতে কিছু কবিতা ও গান রচিত হয়েছে মাত্র, প্রকৃত রাজনৈতিক সংগ্রাম-ও এর ফলে স্তিমিত হয়েছে। তবুও ঘটনার ঐতিহাসিকতা প্রগতি-আন্দোলনের আর এক ধরনের অনুপ্রেরণাস্থল---এ কথা আমাদের মেনে নিতে হবে। এই পর্বের শ্লোগানই ছিল, 'শান্তির আবেদনে সই দাও'। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি-কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর 'পাঠক-দের প্রতি আবেদনে'('পরিচয়' পত্রিকা দ্রষ্টব্য)জানান যে, গত ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্টকহম শান্তি-আবেদনের সপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার স্বাক্ষর জোগাড় হয়েছে। এই আবেদনপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁরা হলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ সেন, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত আবেদনে বলা হয়, 'আমরা এই আশা পোষণ করি যে, শান্তির জন্যে বিশ্বব্যাপী এই সংগ্রামে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবী-দের মত পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে অগ্রসর হয়ে আসবেন।'---সম্পাদক।[২৬৬]
১৯৫০খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবরে সারা ভারতব্যাপী আর [illegible] পশ্চিমবঙ্গে শান্তি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পোল্যান্ডের ভ্রসলাভ(Wroclaw)শহরে বিশ্বের চুয়াল্লিশ টি দেশের প্রায় পাঁচশতাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিজীবী সমবেত হয়ে গঠন করেন 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি'(International Liasion Committee of Intellectuals)। এঁদের প্রয়াস ছিল যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও ইউরোপের ধনবাদী চিন্তা-চেতনার বিকৃত প্রভাব ও সমরবাদের প্রতি ঝোঁক যে সংকট ঘনিয়ে

তুলছে সারা বিশ্বে, তার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও শান্তির সপক্ষে সবাইকে সজাগ করা। ভারত-বর্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষে শান্তি-কমিটি গঠিত হয়, বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই এটা ঘটে। আর একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। সম্ভবত ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৯৪৯খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি'র প্রভাবে এদেশে গড়ে তোলেন 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ'। -'যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিশ্ব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা পোল্যান্ডে 'আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' সমবেত হন, যে-প্রয়োজনে সোভিয়েটের অগ্রণী সাহিত্যিকরা মার্কিন সাহিত্যিকদের কাছে খোলা চিঠি দেন, সেই প্রয়োজনেই আজ দেশে দেশে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে সংগ্রামী সংগঠনের গুরুত্ব অনুভব করছেন।' আর এই প্রয়াস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয় এই পরিষদ। উদ্ধৃত কথাগুলি নরহরি কবিরাজের। ১৩৫৫বঙ্গাব্দের 'পরিচয়'-র 'সংস্কৃতি-সংবাদ'-এ পরিবেশিত।[২৬৭] প্রসঙ্গত আরও একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৯৪৯খ্রীষ্টাব্দের ২৩জুলাই থেকে ৭অগাষ্ট অবধি চেকোশ্লোভাকিয়ার মারিয়ানস্কি-লাজনিতে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ আন্তর্জাতিক চিত্র-উৎসব, সিনে-টেকনিশিয়ানদের দ্বারা সেখানে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধের হিস্টিরিয়াকে পরিপুষ্ট করার নিন্দা করছি, এর সঙ্গেই নিন্দা করছি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির সমস্ত প্রচেষ্টাকে। ...এখানে সমবেত আমরা প্রত্যেকেই ফিল্মের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা এবং শান্তি-পতাকার দিকে সমগ্র বিশ্বের জনসাধারণকে জমায়েত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি।'[২৬৮] এই শান্তি-আহ্বানও আমাদের দেশে প্রেরণার মত কাজ করেছে।

১৯৫০খ্রীষ্টাব্দের ২৮-২৯ অক্টোবর সারা ভারত শান্তি-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে এতে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা। এই কনভেনশনের মূল আহ্বান ছিলঃ'শান্তির শিবিরকে আরও ব্যাপক কর, শান্তির সংগ্রামকে আরও জোরদার কর।' 'সারা ভারত শান্তি কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বিষ্ণুদাস শিরালি। সভাপতি হন ডাঃ অটল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, স্টকহম শান্তির আবেদনে ও তাকে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁদের অন্যতম হলেন কেরালার বৃদ্ধ কবি ভল্লাথোল, মুলকরাজ আনন্দ, খাজা আহমদ আব্বাস প্রমুখ। বর্তমান সভায় বিশেষ বক্তা ছিলেন কৃষণ চন্দর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

'বন্ধুগণ,

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত কার্যবিবরণী দাখিল করা হল এবং বক্তৃতা দেওয়া হল তার মধ্যে কিছু কিছু বিবরণী ও বক্তৃতা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, স্টকহোম-আবেদনের আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন

কোন বন্ধুর বেশ গুরুতর রকমের ভ্রান্তধারণা আছে। কোন কোন বন্ধু বিশ্বাস করেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা এবং এই শেষোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাকে শক্তি জোগানোই এই উপরোক্ত আবেদন প্রচারের উদ্দেশ্য। আবার কোন কোন বন্ধু এও মনে করেন যে, অন্ন-বস্ত্র-জমি ও সুলভ শিক্ষার দাবিতে, শিল্প-ধর্মঘটে বা পুস্তকপ্রকাশকের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁদের দৈনন্দিন আংশিক সংগ্রাম সংগঠিত করার পক্ষে, পুলিশ-জুলুমের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার, কংগ্রেসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পক্ষে স্টকহোম-আবেদনটি একটি সুবিধা-জনক অস্ত্র মাত্র। ...এই সমস্ত বিষয় স্টকহোম-আবেদনের মুখ্য বা এমনকি গৌণ উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। ......'শ্রীযুক্ত জোলিও কুরির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, 'যাঁরা আণবিক বোমার এ ধ্বংসলীলার হাত থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সুগভীর মানব-হিতৈষণার ফলেই' আবেদনপত্রটি রচিত হয়েছে। ...'এর ভিতরে আছে শান্তি, এর বাইরেও আছে শান্তি, এর পিছনে আছে শান্তি, এর অন্তরালেও আছে শান্তি।'[২৬৯]

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০, ১১, ১২ নভেম্বরে। কলকাতায় তিনদিন ধরে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে তিনটি প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করে। এগুলি হল, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখা, নাট্যচক্র, বহুরূপী নাট্যসংস্থা, লিটল থিয়েটার, ইউনিটি থিয়েটার, সুস্থিতা সংঘ ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এই অধিবেশনে যোগদান করেন সুরকার তিমিরবরণ, কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, গায়িকা সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী প্রমুখ।[২৭০] পশ্চিমবঙ্গে স্টকহম শান্তি-আবেদন পত্রে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষে সংগৃহীত স্বাক্ষরের সংখ্যা দু লক্ষ তিন হাজারের কিছু বেশি। ভারতে এই সময়ে সংগৃহীত স্বাক্ষরের সংখ্যা দশ লক্ষ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্বাক্ষর সংগ্রাহক কমিটির সংখ্যা হল পঁচাত্তরটি। ১০ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের বক্তৃতায় পি. সি. যোশী পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে অভিযোগ ও অনুযোগ করে বলেন, 'এখানে শান্তি আন্দোলন যে এখনও সঠিক ব্যাপক গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে এই আন্দোলন এখনও তার জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি এবং তারই ফলে ব্যাপক জনসাধারণকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি।' এই বক্তৃতায় এই আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দেবার জন্যে তিনি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ দেন।[২৭১]

দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন ব্রিটেনের শেফিল্ড শহরের বদলে অনুষ্ঠিত হয় পোল্যান্ডের

ওয়ারশ শহরে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে সেখানে যাবার অনুমতি দেন নি---এঁদের অন্যতম, বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক জোলিও কুরী, সভাপতি, বিশ্বশান্তি কংগ্রেস, জাঁ লাফিৎ, সাধারণ সম্পাদক, এছাড়া আছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আলেকজান্ডার ফাদায়েভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, এমি সিজাও, আনা সেগার্স, আর্নল্ড জুইগ, সোস্টাকোভিচ---এঁদের সকলেই বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য বা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম কৃতী নায়ক। ওয়ারশ-সম্মেলনে ৮১টি দেশের ১৭৫৬জন প্রতিনিধি, ৩০১জন দর্শক ও আমন্ত্রিত ব্যক্তি সম্মেলনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'পোলিশ ন্যাশনাল থিয়েটারে' এক অনুষ্ঠানে শান্তি-পুরস্কারে ভূষিত করা হয় শহীদ জুলিয়াস ফুচিক, পাবলো নেরুদা, পল রোবসন, নাজিম হিকমত ও পাবলো পিকাসোকে। উদ্যোক্তারা একটি আবেদন-বিবৃতিও প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়: 'শান্তি টুপ করে আমাদের হাতে এসে পড়বে না, তাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। ...স্টকহোম আবেদনপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন সেই ৫০কোটি মানুষের সঙ্গে আপনিও আপনার কণ্ঠস্বর মেলান: আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার, সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের এবং এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে তোলার জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দাবি করুন। সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংসের ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা সংগঠনগতভাবে এখনই সম্ভব, আজ শুধু প্রয়োজন শুভবুদ্ধির।'[২৭২]

এই পর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথাও খানিকটা উল্লেখ করা দরকার। ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. টি. রণদিভে পরিচালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছোয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বা কমিনফর্ম-এর মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রাসি'তে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁদের মুখপত্র 'লাস্টিং পীস'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ভারতের সমূহ অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। সেইসঙ্গে পরামর্শ দেওয়া হয় চীনের মুক্তিসংগ্রাম থেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুসৃত রণনীতির শিক্ষা গ্রহণের। ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দের ২২ফেব্রুয়ারীতে কমিনফর্মের সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপরে পলিটব্যুরো প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। তাতে সংশোধনের বদলে বরং নিজেদের অনুসৃত পথেরই গুণগান করা হয়েছে। এই সময়ে মে-জুনে দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে পুরনো কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। ১১জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় নতুন কমিটি। বলা বাহুল্য, এই কমিটিতে বি. টি. রণদিভে, ভবানী সেন প্রমুখদের বাদ দেওয়া হয় এবং সম্পাদক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন সি. রাজেশ্বর রাও। এই পর্বের পার্টির ভেতরকার এবং সাহিত্যিকদের আন্তঃসংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন ধনঞ্জয় দাশ মহাশয়।[২৭৩] বোঝা

যায়, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সুমহান উদ্দেশ্য এই আন্তঃসংগ্রামের মাঝে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সৃষ্টিধর্মের দিক থেকে এ কথা আমাদের মানতে বোধকরি আপত্তি নেই যে, ১৯৪৯-৫০খ্রীষ্টাব্দে প্রগতি লেখকদের আন্দোলন দু'দিক থেকে ক্ষীয়মাণ হয়েছিল। প্রথমত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তঃসংগ্রামের প্রেক্ষিতে, দ্বিতীয়ত অন্তর্কলহব্যতিরেকে শান্তির আন্দোলনে। কেননা শান্তি-আন্দোলন কোন গোষ্ঠীগত ভাবনার কেন্দ্রে অবস্থিত হয় নি, তা ছিল বিশ্বব্যাপী জনগণের সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এই শান্তি-আন্দোলন প্রগতিশীল সাহিত্যের স্তিমিত ধারায় একটুখানি প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। সম্পূর্ণ নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন শেষবারের মত আরও একবার দীপ্তি ছড়ায়, শান্তি-আন্দোলন বস্তুত সেই দীপ্তিটুকুই ছড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশ্য, ১৯৫৩খ্রীষ্টাব্দেও প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের শেষ সম্মেলন কলকাতায় হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের শেষতম প্রয়াস--- চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তিম ঔষধ কোরামিন প্রয়োগের মত ব্যাপারটা।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৩খ্রীষ্টাব্দের এই সম্মেলনটিকে পঞ্চম সম্মেলন বলা হয়েছে। ১১ থেকে ১৫ এপ্রিল অবধি এই অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সম্পাদক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিদায়ী সভাপতি গোপাল হালদার। নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এইভাবে: সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি হিসেবে অজিত দত্ত, শেখ গোলামহাবি, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রমেশ সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কার্যকরী সমিতির সদস্যরা হলেন, অনিল সিংহ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুলেখা সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সুশীল জানা, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সমরেশ বসু, আশীষ বর্মণ, বরেন বসু, অরুণাচল বসু। দু'জন কো-অপ্টেড সদস্যও নেওয়া হয়। একটি ঘোষণাপত্রে বলা হয়: 'আমাদের সাহিত্যকে হতে হবে শিল্পসম্মত এবং সুন্দর। এর রূপ হবে জাতীয়, জনবোধ্য ও লোকহৃদয়গ্রাহী।' সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান শান্তি নেতা ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু, হিন্দী লেখক যশপাল, কবি ভল্লাথোল, এরেনবুর্গ, সিমোনভ, মির্জা তুরসুনজাদ, চীনের তিঙ লিঙ ও 'নিউ এজ উইকলি'র কর্মকর্তা। সম্মেলনকে অভিনন্দিত করে আরও বার্তা পাঠান নাজিম হিকমত, হাওয়ার্ড ফাস্ট, সিয়ান ও কেসী।[২৭৪] প্রসঙ্গত বলা যায়, অজিত দত্ত 'পরিচয়ে' একটি পত্র দিয়ে সংঘের থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন।[২৭৫]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের এই রূপরেখার ভেতর দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ ধরা পড়েছে, আধুনিক বাংলা কবিতাতেও তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। বস্তুত, পরবর্তী অধ্যায়ে সে-আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য।

উল্লেখপঞ্জী

১। Aronson, Alex and Krishna Kripalani, Edited: Rolland And Tagore, Visva-Bharati, Calcutta, 1945, p. 20.22

২। Lenin : On Literature And Art, Progress Publishers, Moscow, Third Printing, 1975

৩। রবীন্দ্র গুপ্তঃ 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৯৫৫, ১৯৭৮

৪। ডঃ রবীন দাশঃ কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ, [illegible] প্রিন্টিং, কলকাতা, ১৯৮০।--গ্রন্থটির অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূমিকা'।

৫। তদেব, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূমিকা'।

৬। Candwell, Cristopher : Illusion And Reality, People's Publishing House, New Delhi, Reprinted, 1981, p. 86

৭। হিরণকুমার সান্যালঃ পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ৮৮

৮। তদেব, পৃঃ৮৬

৯। সুধাংশু দাশগুপ্তঃ কারাগারে কমিউনিস্ট হওয়ার কাহিনী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪।--এছাড়া এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে সুধী প্রধান মন্তব্য জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ গুপ্তচরদের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোকজনও নাকি মার্কসবাদের ওপর রচিত গ্রন্থাদি লেখায় সহায়তা করতেন।

১০। পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৯সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮

১১। Pradhan, Sudhi : Marxist Cultural Movement In India, Vol. 1, National Book Agency Private Limited, Calcutta, 1979, p. 1

১২। পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০বর্ষ, ১০-১২সংখ্যা, মে-জুলাই, ১৯৮১

১৩। সম্মেলনে চারজন-এর উপস্থিত থাকবার কথা। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী অসুস্থতার কারণে যান নি। তাঁর প্রবন্ধ (ইংরেজি) 'টেনডেনসিস ইন কনটেম্পোরারি বেঙ্গলি লিটেরেচার' সভায় পঠিত হয় এবং বহুল প্রশংসিত হয়।

১৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'প্রগতি আন্দোলনের প্রারম্ভ'।-পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০ বর্ষ, ১০-১২সংখ্যা, মে-জুলাই, ১৯৮১

১৫। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ'পরিশিষ্ট-ক', প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ২০০-০৫

১৬। Zaheer, S.S., Published : 'A Note on the Progressive Writers' Movement', Towards Progressive Literature, All India Progressive Writers' Association, p. 1-6

১৭। Ibid, Resolutions No. 2, p. 67

১৮। Ibid, Resolutions No. 3, p. 67-68

১৯। প্রেমচন্দ মুন্সীর প্রবন্ধটি 'The Nature and Purpose of Literature' শিরোনামে। 'Towards Progressive Literature'-এ সংকলিত।
Ibid, p. 7-17

২০। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩০১

২১। Zaheer, S.S., Published : Towards Progressive Literature, All India Progressive Writers' Association, p. 66

২২। The Statesman, 7th July, 1936

২৩। নেপাল মজুমদার: 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়', সাংস্কৃতিক আন্দোলন--অতীত ও বর্তমান সংকলন, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৮০, পৃঃ ৭২

২৪। Zaidi, A.M., Dr. S.G. Zaidi, Chief Editors : The Encyclopaedia of the Indian National Congress (1930-1935), Vol. Ten, S.Chand & Company Limited, New Delhi, 1980, p. 457.

২৫। Ibid, Vol. Eleven, p. 30

২৬। Ibid, p. 31

২৭। Ibid.

২৮। Ibid, p. 59

২৯। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ--এর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা লক্ষ্য করার মত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১৩৫ টি ধর্মঘটে সর্বমোট ১,১৪,২১৭ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন এবং দশ লক্ষের অধিক শ্রমদিবস নষ্ট হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৭ টি ধর্মঘট, অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ১,৬৮,০২৯ জন, যার শ্রমদিবস নষ্ট হয় ৫,৩৫৮,০৬২ টি। জাতীয় কংগ্রেসের 'গণ-সংযোগ'-এর সঙ্গে এই সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব স্বীকার করে সুকোমল সেন বলেছেন, 'গান্ধীর এবং কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থা এবং পাশাপাশি ১৯৩৪ সাল পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি এবং ঐ বৎসরই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের গঠন রাজনীতিতে বামপন্থার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। শ্রমিক আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার পক্ষেও এই পরিস্থিতি ছিল অনুকূল।'---সুকোমল সেন: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ২৬৪, ২৬২

৩০। Zaidi, A.M., Dr. S.G. Zaidi, Chief Editors: The Encyclopaedia of the Indian National Congress (1936-1938), Vol. Eleven, S.Chand & Company Limited, New Delhi, 1980, p. 110-12

৩১। নেপাল মজুমদার: 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়', সাংস্কৃতিক আন্দোলন--অতীত ও বর্তমান সংকলন, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৮০, পৃঃ ৭৩

৩২। তদেব, পৃঃ ৭৪

৩৩। Dutt, R. Palme and Ben Bradley : 'The Anti-Imperialist People's Front', International Press Correspondence, 29, February, 1936; সুধী প্রধানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩৪। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত: প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

৩৫। তদেব, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

৩৬। সুধী প্রধানঃ সংস্কৃতির প্রগতি, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ৮৮

৩৭। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ'প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ', প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ৭২-৭৮

৩৮। তদেব, পৃঃ১-১০

৩৯। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ বক্তব্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ১৬৪-৬৫

৪০। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃপ্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩৫-৫৪

৪১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃসাহিত্যে প্রগতি, পূরবী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃঃদুইশত চল্লিশ

৪২। তদেব, পৃঃদুইশত চল্লিশ-একচল্লিশ

৪৩। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃপ্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ৭৯-৮৫

৪৪। তদেব, পৃঃ৮০

৪৫। তদেব, পৃঃ৮২

৪৬। তদেব, পৃঃ১১-২৫

৪৭। তদেব, পৃঃ২৬-৩৪

৪৮। তদেব, পৃঃ৫৫-৭১

৪৯। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। তারিখঃ ২৮নভেম্বর, ১৯৩৮

৫০। নেপাল মজুমদারঃভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ১৬৬-৬৭

৫১। তদেব, পৃঃ১৬৬

৫২। তদেব, পৃঃ১৭২

৫৩। Pradhan, Sudhi. Edited and Compiled : Marxist Cultural Movement In India, Vol. 1, National Book Agency Private Limited, Calcutta, 1979, pp. 1-20

৫৪। নেপাল মজুমদারঃভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ১৭২-৭৩

৫৫। তদেব, পৃঃ১৭৬-৭৯

৫৬। তদেব

৫৭। S.S. Zaheer, published : Towards Progressive Literature, The Service Press, Allahabad, All India Progressive Writers' Association, p. 63

৫৮। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ৩২১-২২

৫৯। 'পূর্বাশা', পৌষ, ১৩৪৫বঙ্গাব্দ ও 'শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৪৫বঙ্গাব্দের সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর প্রতি আক্রমণ ছিল তীব্রতর। 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠী মতাদর্শের দিক থেকে বামপন্থী শিবির-ভুক্ত না হলেও 'পূর্বাশা'র সে-পরিচয় ছিল। তাতে লেখা হয়ঃ'শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু অতিসম্প্রতি বামপন্থী হয়েছেন।...বুদ্ধদেব বাবু প্রগতি আন্দোলনকে আপন সাহিত্য প্রচারের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন

নিরুপিত হন। তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাশ্রিত একদল বন্ধুকেও তিনি দলে নিতে চান। এই বন্ধুদল নিজেদের সাধারণ্য প্রতিভাকে প্রসারিত পথে চালিত করতে পারেন নি। যেখানে তাঁদের আরম্ভ সেখানেই তাঁদের সমাপ্তি ঘটেছে।'--প্রকাশঃ পূর্বাশা, পৌষ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১১-১২

৬০। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪০

৬১। সুকোমল সেনঃ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ২২২-২৩

৬২। রজনীপাম দত্তঃ আজিকার ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ৫০১

৬৩। Dutt, R. Palme : India To-day, Manisha, Calcutta, Reprint, 1979, p. 428;

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, তরুণ দলের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য যাই হোক না কেন, এই আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বন্দীমুক্তির এক ঐতিহাসিক মহিমালাভ করে তখনই, যখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে অকৃপণ উদারতা প্রদর্শন করেন। কবির জুটমিলের শ্রমিকের সমর্থনে আবেদন প্রকাশিত হয় 'মডার্ন রিভিয়ু'র নিম্নোক্ত সংখ্যায়ঃ Vol. LXI, No. 5, Whole No. 365, May 1937, p. 614

৬৪। Dutt, R. Palme : India To-day, Manisha, Calcutta, Reprint, 1979, pp. 428-29

৬৫। রজনীপাম দত্তঃ আজিকার ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ৫০০

৬৬। Zaidi, A.M., Dr. S.G.Zaidi, Chief Editors: The Encyclopaedia of the Indian National Congress (1936-38), Vol. Eleven, S.Chand and Company Limited, New Delhi, 1980, p. 281

৬৭। The Modern Review, Vol. LXIII, No. 1, Whole No. 373, January, 1938, pp. 112-13

৬৮। Ibid, p. 113

৬৯। রণেন সেনঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৬-০৮

৭০। অমলেন্দু দেঃ চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৩৮-৪০

৭১। তদেব, পৃঃ ৪৩

৭২। রণেন সেনঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১০

৭৩। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ পরিচয় (প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন) মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ২০০-০৩

৭৪। এই স্মৃতিকথায় নলিনী দাস হিমাংশু ভট্টাচার্য-এর বিপ্লবী মানসের পরিবর্তন ও উত্তরণ সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে একজন ব্যক্তির কমিউনিস্ট হয়ে ওঠারই শুধু নয়, যুগ-সংকট ও যুগ-মানস কীভাবে ব্যক্তিকে মার্কসবাদের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে তারও এক প্রতীকী বর্ণনা পাওয়া যায়।

৭৫। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ পরিচয়, (প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন), মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ২০৪

৭৬। তদেব, পৃঃ২০৭-০৫

৭৭। 'রবিবারের পাতা', উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১১মার্চ, ১৯৮৪

৭৮। তদেব

৭৯। Zaidi, A.M., Dr. S.G.Zaidi, Chief Editors: The Encyclopaedia of the Indian National Congress (1936-38), Vol. Eleven, S.Chand and Company Limited, New Delhi, 1980, p. 418

৮০। প্রবোধ সেনঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৩৮৮বঙ্গাব্দ, পৃঃ১০৫

৮১। তদেব, পৃঃ১০৬

৮২। Zaidi, A.M., Dr. S.G. Zaidi, Chief Editors: The Encyclopaedia of the Indian National Congress (1936-38), Vol. Eleven, S.Chand and Company Limited, New Delhi, 1980, p. 495-96

৮৩। একশত ষাটজন এ. আই. সি. সি. সদস্যের স্বাক্ষর-সম্বলিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, অ-নির্বাচিত একজন ব্যক্তির হাতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার অর্পণের মত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রস্তাবটির জন্য দ্রষ্টব্যঃ Sitaramayya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress (1935-1945), Vol. II, S. Chand and Company, New Delhi, First Reprint, 1969, p. 110

৮৪। কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু নিজে তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করতে পারেন নি তাঁর ১০৪° ডিগ্রি জ্বরের কারণে। তাঁর শারীরিক অসুস্থতাহেতু তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু ভাষণটি পাঠ করেন।

৮৫। মার্চ, ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাহান্নতম অধিবেশনে তাঁর অভিভাষণটির ভাষা ছিল এইরকমঃ "In the first place, I must give clear and unequivocal expression to what I have been feeling for some time past, namely, that the time has come for us to raise the issue of Swaraj and submit our national demand to the British Government in the form of an ultimatum. The time is long past when we could have adopted a passive attitude and waited for the Federal scheme to be imposed on us ..." ইত্যাদি। দ্রষ্টব্যঃ Subhas Chandra Bose (Edited by Sisir Bose) : Cross Roads, Netaji Research Bureau, Calcutta, 2nd Edition, 1981, pp. 108-11;

এই ভাষণের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ Sitaramayya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress (1935-1947), Vol. II, S.Chand and Company, New Delhi, First Reprint, 1969, p. 111

৮৬। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এলাহাবাদ-অধিবেশনে (১৮-১৯ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) ব্রিটিশ সরকারকে 'চরমপত্র' দেবার সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন এবং অনুরূপ মর্মে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন।

৮৭। রণেন সেনঃ বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ১১৩-১৪

৮৮। লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ দেশগুলোর যে মেহনতি জনগণ বিপ্লব পথে পরিসংখ্যানের দিক থেকেই বিপুলতম, তাদের জাগরণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় এক বিরাট শক্তি ধরে, এই শক্তির বিকাশ ও স্ফূর্তিকে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে ও বৈপ্লবিক অর্থে প্রয়োগ করার কৌশল সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলে আন্দোলনের আসল তাৎপর্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে 'সুবিধাবাদ' 'অতিবামপন্থা', সংকীর্ণতা' (বা যান্ত্রিক অনুসরণ) ও ব্যক্তিগত 'সন্ত্রাসবাদ'কে উল্লেখ করেছেন তিনি। দ্বিতীয় কংগ্রেসে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিন তাঁর থিসিসের সমর্থনে যে বক্তব্য রাখেন তার জন্যে দ্রষ্টব্যঃ V.I. Lenin : Selected Works, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, Revised Edition, 1977, pp. 373-74, 376-77

৮৯। খালেদ চৌধুরী, অনূদিতঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ৩০২

৯০। তদেব, পৃঃ৩০২-০৩

৯১। সম্পূর্ণ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্যঃ 'International Press Correspondence', Vol. 8, No. 88, November-December-সংখ্যা;

অথবাঃ খালেদ চৌধুরী অনূদিত গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক রূপরেখা', পৃঃ৩০২-০৩

৯২। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ৪৪৪-৪৫

৯৩। তদেব, পৃঃ৪৪৪-৪৫

৯৪। তদেব

৯৫। Sitaramayya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress (1935-1947), Vol. II, S.Chand and Company, New Delhi, First Reprint, 1969, p. 125

৯৬। Ibid, pp. 136-37

৯৭। Bose, Sisir K., Edited : Crossroads (The works of Subhas Chandra Bose : 1938-1940), Netaji Research Bureau, Calcutta, Second Edition, 1981, pp. 290-91

৯৮। Hindusthan Standard, 20 March, 1940;
এছাড়া দ্রষ্টব্যঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী'র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন--অতীত ও বর্তমান' সংকলনে নেপাল মজুমদারের প্রবন্ধ 'প্রগতি লেখক

আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়'-এর পরিশিষ্ট, পৃঃ তেত্রিশ

৯৯। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে', মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ চব্বিশ

১০০। 'অগ্রণী' পত্রিকা বন্ধ হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ চিন্মোহন সেহানবীশ রচিত 'এলোমেলো স্মৃতিকথা', আজকাল, শারদীয়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯

১০১। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে', মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ চব্বিশ-পঁচিশ

১০২। পবিত্র সরকারের নিবন্ধ 'ছাত্র-আন্দোলনঃ ব্যক্তিগত পর্যালোচনা', আজকাল, শারদীয়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০

১০৩। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃঃ ৩০১-০২

১০৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ 'এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ন্যাৎসী আক্রমণের সংবাদ জগৎকে স্তম্ভিত করে দিল, আর আমাদের মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েতভূমি সম্বন্ধে নূতন এবং একান্ত আত্মীয় এক অনুভূতি।'

আমাদের স্মরণে আছে রবীন্দ্রনাথের কথাও। প্রগতি-আন্দোলনের পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই সময়কার পার্টির সদ্যগৃহীত প্রস্তাব কবিকে দেখালে কবি খুব খুশি হন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পূর্বঘোষণা করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন কবি, একথাও আমরা জানি। শুধু তাই নয়, শ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তবে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ নিজের স্বার্থে সোভিয়েতকে সাহায্য করবে বলছে বটে, কিন্তু 'বিশ্বাস কোরো না ওদের, তোমরা কম্যুনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা-ঢিলা দিয়ো না।'--দ্রষ্টব্যঃ তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪১৬-১৭

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট নন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে লালন করেছিলেন সোভিয়েতের জন্যে শুভেচ্ছা। রোলাঁ একদা বলেছিলেন, যে কোন বিপদে তিনি স্বয়ং সোভিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াবেন। (শিল্পীর নবজন্ম, পৃঃ ১৮২)। জওহরলাল নেহরুর একটি বিখ্যাত উক্তি হল--তিনি ফ্যাসিজম আর কমিউনিজমের মধ্যে বেছে নেবেন কমিউনিজমকে। অ-কমিউনিস্ট মহলেও সোভিয়েতের প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি এইসময় লক্ষ্য করা গেছে।

১০৫। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৫৫৭-৫৮

১০৬। Dimitrov, Georgi : United Front of the Working Class Against Fascism (Report to the Seventh World Congress of the Communist International 1935 with reply & resolution), Culture Publishers, Calcutta, Reprint, 1969, p. 158

১০৭। নরেন চৌধুরী, অনুদিতঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৫৬-৫৭

১০৮। তদেব, পৃঃ ৫৭০

১০৯। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৫৬১-৬৪

১১০। অরুণী গোস্বামীর নিবন্ধ 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সূচনা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংহতি', সোভিয়েত দেশ, ৫সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৫

১১১। নেপাল মজুমদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে (ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ৫৬১-৬৪) যে সূচী উদ্ধার করেছেন তাতে চিন্মোহন সেহানবীশ ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ নেই। এর সঙ্গে দ্রষ্টব্য ২৭জুলাই, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' সংবাদপত্রটি।

১১২। 'দ্য ল্যান্ড অব দ্য সোভিয়েটস' বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। 'সোভিয়েত দেশ' (বাংলা সংস্করণ) প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৪৮বঙ্গাব্দে। এটি রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। লেখকসূচীতে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, সরোজকুমার দত্ত, সুর্নকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র প্রমুখ। ইংরেজি সংকলনটি স্নেহাংশু-কান্ত আচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও সেপ্টেম্বর, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। লেখকসূচীতে ছিলেন গোপাল হালদার, জ্যোতি বসু, স্টেলা ব্রাউন, এলা সেন, মণিকুন্তলা সেন, এস,কে ,আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ।

১১৩। ১৫নভেম্বর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের 'পীপলস ওয়ারে' প্রকাশিত প্রতিবেদনে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেন যে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পর প্রগতি আন্দোলন একটু ঝিমিয়ে পড়ে। এর কারণ হিসেবে তিনি 'সাংগঠনিক ভিত্তির অভাব'কেই দায়ী করেছেন।

১১৪। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃবাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ১১৮-১৯, মুদ্রিত প্রতিবেদনটি চৈনিক সুহৃদের সৌজন্যে দেখতে পেয়েছি।

১১৫। 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনসংঘ'-এর সংগঠক ছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, কয়েকটি পুস্তিকা এই সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এঁদের কার্যক্রমের বিস্তৃত তথ্যের অপ্রতুলতাহেতু এবিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হল না।

১১৬। জনযুদ্ধ, ১মবর্ষ, ৫সংখ্যা, ৩০মে, ১৯৪২

১১৭। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ'চল্লিশ দশকের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনঃপূর্বরঙ্গ'(কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত রচিত), পরিচয়(প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন), মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ২০৬-০৭

১১৮। দ্রষ্টব্যঃ বিজন রায়ের 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'--পরিশিষ্ট-২, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ(২৪৯নং বহুবাজার স্ট্রীট)কর্তৃক প্রকাশিত।

১১৯। The Modern Review, Vol. LXXI, No. 4, Whole No. 424, April, 1942, P.326

১২০। বিজন রায়ের 'জাপানী শাসনের আসল রূপ'-পরিশিষ্ট-১ এবং বিষ্ণু দে-র '২২শে জুন' পুস্তিকার শেষাংশে যে নামগুলির তালিকা রয়েছে তাতে মিল নেই। পরিবর্তিত নামগুলি থেকে অনুমান করা চলে, একাধিক সভা বা সম্মেলনের জন্যে এরকমটা হয়ে থাকবে। '২২শে জুন' পুস্তিকাটিও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল অমুদ্রিত।

১২১। দর্শন চৌধুরীঃগণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ১৫, তারিখটি সম্পর্কে শ্রী চৌধুরী নিশ্চিত নন, বলেছেন। অনুমান করি, উক্ত সম্মেলনে সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী ও নাট্যশিল্পীরা কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের চিন্তায় সেই কারণে 'শিল্পী' কথাটি যুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

১২২। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৪সংখ্যা, ২০মে, ১৯৪২

১২৩। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৩সংখ্যা, ১৩মে, ১৯৪২

১২৪। Zaidi, A.M., Dr. S.J. Zaidi, Chief Editors: The Encyclopaedia of the Indian National Congress, Vol. Twelve, S.Chand and Company, New Delhi, 1981, pp. 386-87

১২৫। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৫সংখ্যা, ৩০মে, ১৯৪২

১২৬। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৫সংখ্যা, ৩০মে, ১৯৪২ এবং The Modern Review, Vol. LXXI, No. 6, Whole No. 426, June, 1942, p. 514

১২৭। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৬সংখ্যা, ১০জুন, ১৯৪২

১২৮। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৬সংখ্যা, ১০জুন, ১৯৪২

১২৯। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৭সংখ্যা, ১৭জুন, ১৯৪২

১৩০। গোপাল হালদার, সম্পাদিত: বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ১৯৭

১৩১। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৯সংখ্যা, ১জুলাই, ১৯৪২

১৩২। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১০সংখ্যা, ৮জুলাই, ১৯৪২

১৩৩। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১১সংখ্যা, ১৫জুলাই, ১৯৪২

১৩৪। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১৪সংখ্যা, ৫আগস্ট, ১৯৪২

১৩৫। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১৫সংখ্যা, ১২আগস্ট, ১৯৪২

১৩৬। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১১সংখ্যা, ১৫জুলাই, ১৯৪২

১৩৭। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ২৩সংখ্যা, ৭অক্টোবর, ১৯৪২

১৩৮। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৩০সংখ্যা, ২ডিসেম্বর, ১৯৪২

১৩৯। 'শিল্পীর দায়িত্ব', অরণি, ২য় বর্ষ, ১৭সংখ্যা, ২৫ডিসেম্বর, ১৯৪২

১৪০। 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ'-এর অস্তিত্বের কথা 'জনযুদ্ধে'র ১ম বর্ষ, ৩৩সংখ্যা, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ ছাড়া কোথাও চোখে পড়ে নি। তবে 'জনযুদ্ধে'র ১ম বর্ষ, ২৩সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের প্রতিবেদনে হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের ৪অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘের তরফে ঘরোয়া সম্মেলনের সংবাদ রয়েছে। এতে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবু রুশদ, আয়ুবুল হক খাঁ, আবদুল কাদের, আবুল হোসেন(বা 'হাসেম' উল্লেখও চোখে পড়েছে), গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। অনুমান করা যায় উক্ত সংঘ গঠিত হয়ে থাকলে ৪অক্টোবর, ১৯৪২-এর পরেই হয়ে থাকতে পারে। তবে এবিষয়ে তথ্যের বিশেষ হদিশ মেলে নি।

১৪১। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৩৩সংখ্যা, ২৩ডিসেম্বর, ১৯৪২, শিরোনাম: 'ফ্যাসিবাদকে রুখিতে গাঙ্গুলী, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে তুলি-লেখনীর স্থান: ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের দাবী'।

১৪২। বুদ্ধদেব বসুর লিখিত প্রতিবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় 'ফ্যাসিবাদ, শিল্প ও বিশ্বমানব' শিরোনামে,-- পরিচয়, ১৪ খণ্ড, ১২বর্ষ, ৬সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৯। সংঘের পক্ষ থেকে সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামেও তাঁর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বিষয় এক।

১৪৩। নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনের কার্যাবলী সম্বলিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। তারিখ ১৯ডিসেম্বর,১৯৪২। শিরোনাম:'ফ্যাসিবাদ, সমাজ ও শিল্প'। দ্রষ্টব্য: -পরিচয়,১ম খণ্ড,১২বর্ষ, ৬সংখ্যা,পৌষ,১৩৪৯

১৪৪। অরণি,২য় বর্ষ,১৯সংখ্যা,৮জানুয়ারী,১৯৪৩

১৪৫। অরণি,২য় বর্ষ,২১সংখ্যা,২২জানুয়ারী,১৯৪৩

১৪৬। ,, ,, ,, ,, ,,

১৪৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়:পঞ্চাশের মন্বন্তর,বেঙ্গল পাবলিশার্স,কলকাতা,১৩৫০বঙ্গাব্দ,পৃ:১৭-১৮

১৪৮। জনযুদ্ধ,১ম বর্ষ,৩৬সংখ্যা,২৪মার্চ,১৯৪৩

১৪৯। জনযুদ্ধ,১ম বর্ষ,৪০সংখ্যা,২১এপ্রিল,১৯৪৩

১৫০। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়:দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সাত রঙা প্রকাশন,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৮২,পৃ:৭৮৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১সংখ্যা,২৮এপ্রিল,১৯৪৩

১৫২। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৯সংখ্যা,২৩জুন,১৯৪৩

১৫৩। অরণি,২য় বর্ষ,৩৫সংখ্যা,৭মে,১৯৪৩

১৫৪। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়:দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সাত রঙা প্রকাশন,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৮২,পৃ:৭৮৬

১৫৫। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১২সংখ্যা,১৪জুলাই,১৯৪৩

১৫৬। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৪সংখ্যা,২৮জুলাই,১৯৪৩

১৫৭। জনযুদ্ধ,১ম বর্ষ,৩১সংখ্যা,১৭ফেব্রুয়ারী,১৯৪৩

১৫৮। অরণি,২য় বর্ষ,২২সংখ্যা,৫ফেব্রুয়ারী,১৯৪৩

১৫৯। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১সংখ্যা,২৮এপ্রিল,১৯৪৩

১৬০। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৩সংখ্যা,১২মে,১৯৪৩

১৬১। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৫সংখ্যা,২৬মে,১৯৪৩

১৬২। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৭সংখ্যা,৯জুন,১৯৪৩

১৬৩। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৯সংখ্যা,২৩জুন,১৯৪৩

১৬৪। অরণি,২য় বর্ষ,৪৩সংখ্যা,২জুলাই,১৯৪৩ ও ৪৪সংখ্যা,৯জুলাই,১৯৪৩

১৬৫। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৯সংখ্যা,২৩জুন,১৯৪৩

১৬৬। উদ্ধৃতিটির অংশ দ্রষ্টব্য এস. এ. ডাঙ্গের 'লিটারেচার এ্যাণ্ড দা পীপল' পুস্তিকাটিতে সাজ্জাদ জহীরের ভূমিকাংশ।-- People's Publishing House, Bombay, 1943

১৬৭। Dange, S.A. : Literature And the People, People's Publishing House, Bombay, May, 1943, p. 19 (Address to the Fourth All India Progressive Writers' Conference on 22nd May, 1943, in Bombay)

১৬৮। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৫সংখ্যা,৪আগস্ট,১৯৪৩

১৬৯। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৬সংখ্যা,১১আগস্ট,১৯৪৩

১৭০। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৭সংখ্যা,১৮আগস্ট,১৯৪৩

১৭১। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৭সংখ্যা,১৮আগষ্ট,১৯৪৩

১৭২। .. ..

১৭৩। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,১৯সংখ্যা,১সেপ্টেম্বর,১৯৪৩

১৭৪। অরণি,৩য় বর্ষ,২সংখ্যা,৩সেপ্টেম্বর,১৯৪৩

১৭৫। অরণি,৩য় বর্ষ,১৪সংখ্যা,১৩ডিসেম্বর,১৯৪৩

১৭৬। ধনঞ্জয় দাশ,সম্পাদিতঃ'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে',মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,প্রথম খন্ড,নতুন পরিবেশ প্রকাশনী,কলকাতা,দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৭৯,পৃঃত্রিশ

১৭৭। জনযুদ্ধ,স্বাধীনতা দিবস,৩৯সংখ্যা,২৬জানুয়ারী,১৯৪৪

১৭৮। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,সম্পাদিতঃপরিচয়(প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন,মনীষা,কলকাতা,১৯৭৫,পৃঃ৩০২

১৭৯। অরণি,৩য় বর্ষ,২২সংখ্যা,৪ফেব্রুয়ারী,১৯৪৪

১৮০। .. ..

১৮১। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে বিষ্ণু দে-র নাম, কিন্তু কোথাও চিন্মোহন সেহানবীশের নামের উল্লেখ 'জনযুদ্ধ' বা 'অরণি'তে চোখে পড়ে নি। তথ্যটি তাই সন্দেহ উদ্রেক করে।

১৮২। জনযুদ্ধ,স্বাধীনতা দিবস,৩৯সংখ্যা,২৬জানুয়ারী,১৯৪৪

১৮৩। অরণি,৩য় বর্ষ,২১সংখ্যা,২৮জানুয়ারী,১৯৪৪

১৮৪। সমগ্র প্রতিবেদনটির জন্যে দ্রষ্টব্যঃজনযুদ্ধ,স্বাধীনতা দিবস,৩৯সংখ্যা,২৬জানুয়ারী,১৯৪৪, অরণি,৩য় বর্ষ,২২সংখ্যা,৪ফেব্রুয়ারী,১৯৪৪--এই সংখ্যায় অনামী 'কথাপ্রসঙ্গে' সংক্ষিপ্ত রিপোর্টাজ করেছেন উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে।

১৮৫। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৪০সংখ্যা,২ফেব্রুয়ারী,১৯৪৪

১৮৬। .. ..

১৮৭। জনযুদ্ধ,২য় বর্ষ,৪২সংখ্যা,১৬ফেব্রুয়ারী,১৯৪৪

১৮৮। জনযুদ্ধ,মে দিবস,৩য় বর্ষ,১সংখ্যা,১মে,১৯৪৪

১৮৯। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,২সংখ্যা,১০মে,১৯৪৪

১৯০। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,৭সংখ্যা,১৪জুন,১৯৪৪

১৯১। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,৭সংখ্যা,১৪জুন,১৯৪৪

১৯২। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,৯সংখ্যা,২৮জুন,১৯৪৪

১৯৩। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,১০সংখ্যা,৫জুলাই,১৯৪৪

১৯৪। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,১৭সংখ্যা,২৩আগষ্ট,১৯৪৪

১৯৫। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,২২সংখ্যা,৪অক্টোবর,১৯৪৪

১৯৬। জনযুদ্ধ,৩য় বর্ষ,২৪সংখ্যা,১৮অক্টোবর,১৯৪৪

১৯৭। ধনঞ্জয় দাশ,সম্পাদিতঃ'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে',মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,প্রথম খন্ড,নতুন পরিবেশ প্রকাশনী,কলকাতা,দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৭৯,পৃঃএকান্ন

১৯৮। তদেব,পৃঃবাহান্ন

১৯৯। পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫১

২০০। দুটি সংখ্যা 'পরিচয়ে' বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্যঃ চতুর্দশ বর্ষ, ৬ ও ৭ম সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ, ১৩৫১

২০১। ধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'র (প্রথম খণ্ড) ভূমিকাংশে ৩মার্চ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন (পৃঃ উনত্রিশ); সম্ভবত তিনি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পিপলস ওয়ার'এর (১৫এপ্রিল, ১৯৪৫) প্রতিবেদন 'বেঙ্গলস লীডিং রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিস্টস মিট ইন কনফারেন্স'-দেখে। 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থের 'নির্দেশপঞ্জী'তেও উক্ত তারিখটি যুগান্তর চক্রবর্তী ব্যবহার করেছেন।

২০২। দ্রষ্টব্যঃ জনযুদ্ধ, ৩য় বর্ষ, ৩৩-৩৪ সংখ্যা, ১৫ মার্চ, ১৯৪৫; পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১

২০৩। 'পরিচয়ে' প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর ও সাহিত্য' প্রবন্ধটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে---'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সম্মেলনে পঠিত অভ্যর্থনা সভাপতির অভিভাষণ'। সম্ভবত প্রবন্ধটি এই সম্মেলনে অর্থাৎ তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত হয়। দ্রষ্টব্যঃ পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১

২০৪। চিন্মোহন সেহানবীশের প্রতিবেদন 'লেখক ও শিল্পী সম্মেলন' অনুসারে।--পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১

২০৫। গোপাল হালদারের প্রতিবেদন 'ইতরতার বেসাতি' অনুসারে।-পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

২০৬। ভবানী সেনঃ নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৮২-৮৩

২০৭। তদেব, পৃঃ ৮৭-৮৮

২০৮। অরণি, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২১সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

২০৯। 'পি. সি. যোশীকে মহাত্মা গান্ধী', গান্ধী-যোশী পত্রালাপ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃঃ ২৪

২১০। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪৩২

২১১। Sitaramayya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress, Vol. II, S.Chand and Company, New Delhi, First Reprint, 1969, p. 678

২১২। Dutt, R. Palme : India To-day, Manisha, Reprint, 1979, p. 573

২১৩। অরণি, ৫ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১মার্চ, ১৯৪৬

২১৪। Sitaramayya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress, Vol. II, S.Chand and Company, New Delhi, First Reprint, 1969, p. 805

২১৫। অরণি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০শে মার্চ, ১৯৪৬

২১৬। অরণি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৭মে, ১৯৪৬

২১৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৫১৬-১৭

২১৮। Pradhan, Sudhi, Compiled and Edited : Marxist Cultural Movement In India, Vol. I, National Book Agency Private Limited, Calcutta, 1979, p. 336-41

২১৯। ভবানী সেন: নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ১০৪

২২০। Desai, A.R., Edited : Peasant Struggles in India, Oxford University Press, New Delhi, 2nd impression, 1982, p. 443

২২১। Ibid.

২২২। ভবানী সেন: নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ১০৫

২২৩। তদেব, পৃঃ১০৮

২২৪। বদরুদ্দীন উমর: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ভারতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ১০০

২২৫। মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল: কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৫১

২২৬। ভবানী সেন: নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ১১১

২২৭। চারু মজুমদার: সংগৃহীত রচনাবলী, দেশব্রতী প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮২, পৃঃ৭

২২৮। Desai, A.R., Edited : Peasant Struggles in India, Oxford University Press, New Delhi, 2nd impression, 1982, p. 495

২২৯। Ibid, p. 510

২৩০। Sundarayya, P. : 'Foreword' by M. Basavapunnaiah, Telangana People's Armed Struggle (1946-1951), National Book Centre, New Delhi, 1985

২৩১। Sundarayya, P. : Telangana People's Armed Struggle (1946-1951), National Book Centre, New Delhi, 1985, pp. 3-4

২৩২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃঃ৪১৫-১৬

২৩৩। Decisions of the Central Committee, C.P.S.U.(B), On Literature And Art (1946-1948), p. 5
সুধী প্রধানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৩৪। Ibid, p. 6

২৩৫। Ibid, p. 7-8

২৩৬। Soviet Writers' Congress, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977, p. 275

২৩৭। Ibid, p. 21

২৩৮। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'মূলনীতি: সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি', সন, তারিখ অনুল্লিখিত।--সুধী প্রধানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৩৯। সুধী প্রধানঃসংস্কৃতির প্রগতি,পুস্তক বিপণী,কলকাতা,১৩৮১বঙ্গাব্দ,পৃঃ৬১

২৪০। ধনঞ্জয় দাশ,সম্পাদিতঃ'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে',মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,প্রথম খন্ড,নতুন পরিবেশ প্রকাশনী,কলকাতা,দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৭৯,পৃঃতেষট্টি

২৪১। তদেব,পৃঃসাতষট্টি

২৪২। প্রদ্যোৎ গুহঃমার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা,চলতি দুনিয়া প্রকাশনী,কলকাতা,১৯৭৫,পৃঃ১৮০-২১১

২৪৩। Rao, M.B., Edited : 'Introduction', Documents of the History of the Communist Party of India (1948-1950), Vol. VII, People's Publishing House, New Delhi, 1976, p. viii

২৪৪। Second Congress of the Communist Party of India, Opening Report by Comrade B.T. Ranadive On The Draft Political Thesis, Bombay, 29th February, 1948, p. 6

২৪৫। Ibid, p. 10

২৪৬। Ibid, p. 13

২৪৭। Rao, M.B., Edited : Documents of the History of the Communist Party of India (1948-1950), Vol. VII, People's Publishing House, New Delhi, 1976, p. 74

২৪৮। Ibid, p. 74

২৪৯। Lenin, V.I. : Selected Works, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, Revised Edition, 1977, p. 310

২৫০। উদ্ধৃতি তিনটি হিরণকুমার সান্যালের জবাবী প্রবন্ধ('পরিচয়-প্রসঙ্গ'-৫)থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ পরিচয়,১ম খন্ড,ষোড়শ বর্ষ,৬সংখ্যা,পৌষ,১৩৫৩

২৫১। তদেব

২৫২। 'পাঠক গোষ্ঠী',পরিচয়,২য় খন্ড,ষোড়শবর্ষ,২সংখ্যা,ফাল্গুন,১৩৫৩

২৫৩। তদেব

২৫৪। পরিচয়,২য় খন্ড,ষোড়শ বর্ষ,৩সংখ্যা,চৈত্র,১৩৫৩

২৫৫। 'সংস্কৃতি সংবাদ',পরিচয়,২য় খন্ড,ষোড়শবর্ষ,৪সংখ্যা,বৈশাখ,১৩৫৪

২৫৬। সুধী প্রধানের প্রতিবেদন 'বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য' অনুসারে।-পরিচয়,১ম খন্ড,সপ্তদশ বর্ষ,২সংখ্যা,ভাদ্র,১৩৫৪,অন্যত্রঃঅরণি,৭ম বর্ষ,৪সংখ্যা,১১সেপ্টেম্বর,১৯৪৭

২৫৭। পরিচয়,১ম খন্ড,সপ্তদশ বর্ষ,৬সংখ্যা,পৌষ,১৩৫৪

২৫৮। 'সংস্কৃতি সংবাদ',পরিচয়,২য় খন্ড,সপ্তদশ বর্ষ,১সংখ্যা,মাঘ,১৩৫৪

২৫৯। 'সম্পাদকীয়',পরিচয়,২য় খন্ড,সপ্তদশ বর্ষ,২সংখ্যা,ফাল্গুন,১৩৫৪

২৬০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি প্রকাশিত হয় পরিচয়,১ম খন্ড,বিংশ বর্ষ,১সংখ্যা,শ্রাবণ,১৩৫৭ এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটি--পরিচয়,১ম খন্ড,বিংশ বর্ষ,২সংখ্যা,ভাদ্র,১৩৫৭তে।

২৬১। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে', মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৯, পৃঃ ছিয়াত্তর

২৬২। তদেব, পৃঃ একাশি-বিরাশি

২৬৩। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬, এছাড়া দ্রষ্টব্যঃ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'র দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ২০৮-১২

২৬৪। ভবানী সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা', 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' বা প্রদ্যোৎ গুহে'র 'বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' ইত্যাদি প্রবন্ধ এই পর্বের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রবন্ধ। 'মার্কসবাদী'(অষ্টম সংকলন) পত্রিকার প্রকাশক ইতিপূর্বে প্রকাশিত ১২টি প্রবন্ধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিনাশর্তে, বলে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে বলেছেন, 'মার্কসবাদী'তে বহু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বহু অ-মার্কসীয় লেখা বের হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অনুসৃত ও প্রচারিত ভুল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী রাজনীতিই এর জন্য দায়ী।' ---ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ১ম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৯, পৃঃ১৩৪

২৬৫। 'পাঠক গোষ্ঠী', পরিচয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ২সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৭

২৬৬। পরিচয়, শারদীয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৩সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৭

২৬৭। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে', মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃঃ সাত-নয়

২৬৮। পরিচয়, শারদীয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৩সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৭

২৬৯। পরিচয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৪সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৭

২৭০। 'সংস্কৃতি সংবাদ', পরিচয়, বিংশ বর্ষ, ৫সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

২৭১। পরিচয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৪সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৭

২৭২। পরিচয়, ১ম খণ্ড, বিংশ বর্ষ, ৫সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

২৭৩। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কপ্রসঙ্গে', মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃঃ আটত্রিশ-একচল্লিশ

২৭৪। 'সংস্কৃতি সংবাদ', পরিচয়, ২য় খণ্ড, ৪সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬০

২৭৫। 'পাঠক গোষ্ঠী', পরিচয়, ১ম খণ্ড, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৪সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬০